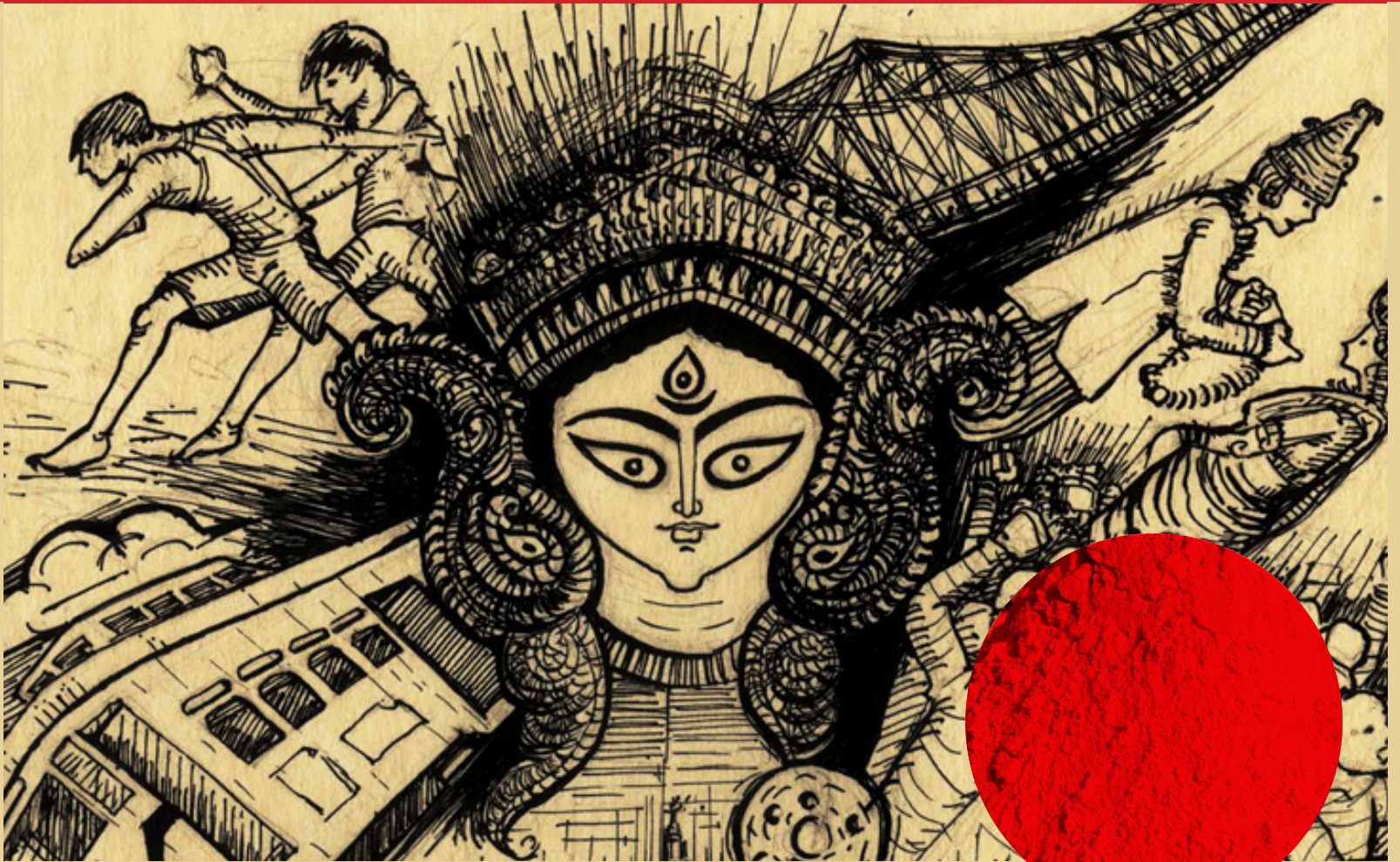


2014 | www.probasee.co.nz

NEW ZEALAND SARBOJONIN DURGOTSAV



Organised by

**PROBASEE BENGALÉE ASSOCIATION
OF NZ INC.**



AFFORDABLE QUALITY HEALTH CARE

- St Lukes Medical Centre welcomes new patients offering comprehensive health care
- The staff take great pride in their legacy of quality care & outstanding service
- 1-Stop Shop – comprehensive service founded with a vision to serve the health needs of the entire community from General, Family, ACC Accident and Immigration Medical to Mole map removal and minor surgery all under the same roof with in-house pharmacy (offers funded prescription fees) free acupuncture, physiotherapy, sports injury under ACC and pregnancy massage.
- Patients can see the GP of their choice
- Short waiting time 15-20 mins
- Extra doctors available for walk-in patients
- Personalised care @ affordable price
- Standard consultations @ \$17.50 for funded patients
- Funded rate from day of enrolment –
- offer ends October 2014
- Prompt online registration recommended
- Reduced fee entitlement for all funded patients at all White Cross and A&M Services
- Comprehensive skin care clinic
- NZ Australia has the highest skin cancer rate in the world, even among ethnic minorities
- Highest quality mole map at affordable price
- Skin cancer, pre-cancer, mole removal from face & body
- Minor surgery with excellent cosmetic outcome
- Skin and Hair Clinic
- General Medical & Family Health
- Newborn and Childhood Immunisations



- Women's health - Fertility, Menstrual irregularity, Hormone imbalance, Pregnancy, Contraception,
- Weight management clinic
- Accident and Emergency
- Sports and Fitness medicine
- Travel Medicine and vaccinations.
- Dr Bashir Ahmed (MBBS, FRNZCGP, Advanced Training in Mole Map /Dermoscopy and Skin Surgery). He speaks English, Bengali and Hindi and has 15 years of Clinical Experience with special interest in Sports, Fitness, Accident and Emergency Medicine and Mole Map. Dr Ahmed has a unique gift in removal of any unsightly lesions, moles, pre- cancer and lifesaving melanoma lesions. He has great charisma for any minor surgery with outstanding aesthetic outcome at affordable rate with great followings from around Australasia. He is equally competent in General and Family Medicine, Children and Women's health. Dr Ahmed runs a very successful comprehensive Men's Health Clinic for hair loss, sexual health, STI and others disorders.
- He teams up with Dr Mahlaqa Husain – MBBS, Diploma in Paediatrics (Auckland) and PG Cert in Women's Health (Otago). She speaks Bengali, English, Hindi and Urdu. Dr Husain specialises in her unique style of general practice, combining 15 years of clinical acumen with care and empathy in a patient-centered approach. She feels it is her calling to render the best possible management for the unwell at their times of need. Her special interests are all aspects of Paediatrics, Womens health, Mens health, Gynae, Fertility, Menstrual and Hormonal disorders like PCOS, Thyroid and Diabetes.
- At St Lukes Medical Centre your health is of paramount importance to us. Should you not enrol today?

Courtesy Mr Amit Sengupta



NZ Sarbojonin Durgotsav-2014

Since 1992

Venue: NZ Athia Trust Society, 37 Selwyn St, Onehunga Auckland 1061

PUJA PROGRAMME

Friday 3rd October

6:00 pm

7:00 pm

9:30 pm

Pratima Sthapan

Cultural programme

Dinner

Saturday 4th October

10:30 am

12:30 pm

01:00 pm

01:15 pm

03:30 pm

07:15 pm

08:00 pm

09:30 pm

Bodhan & Mahashashthi Puja

Arati/Pushpanjali

Prasad and Lunch

Mahasaptami Puja

Arati/Pushpanjali

Sandhyarati

Cultural Programme

Dinner

Sunday 5th October

10:30 am

12:30 pm

01:00 pm

01:15 pm

01:45 pm

03:15 pm

03:30 pm

07:00 pm

08:15 pm

09:15 pm

Mahashtami Puja

Arati/Pushpanjali

Prasad and Lunch

Sandhi Puja

Mahanavami Puja

Arati/Pushpanjali

Havan

Dasami Puja

Varan

Dinner

প্রেসিডেন্টের ডেস্ক থেকে

জয়ন্ত ভাদুড়ী

দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল। সময় যেন এক খরস্রোতা নদীর মত। কখন যে কোথা দিয়ে পার হয়ে যায়, বোঝা যায় না। বাংলার শরতের মত বসন্ত এখন নিউজিল্যান্ডে তার সৌন্দর্যের ডালি উজার করে দিয়েছে। এই বসন্তের দূর প্রবাসে, প্রতি বছরের মত, এবারও আমরা, প্রবাসী বাঙালীরা, ধুমধাম করে মাতৃ-যজ্ঞের আয়োজন করেছি। নুতন জামা-কাপড়-ধুতি-পাঞ্জাবী-শাড়ী পরে, কোলাহলে ভরে ওঠে আমাদের পূজামণ্ডপ, আর শুরু হয় মায়ের আরাধনার আনন্দ-যজ্ঞ। ‘প্রবাসী বেঙ্গলী অ্যাসসিসশনে’র ২৩-তম, এই “আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ।” সকলকে জানাই স্বাগত। “সবারে করি আহবান”।

এবার ৩রা অক্টোবর সন্ধ্যায় আমাদের পূজা মণ্ডপে ([NZ Athia Trust Society, 37 Selwyn St, Onehunga, Auckland](#)) মা তাঁর পরিবার বর্গ নিয়ে আসছেন নৌকায়। এবং ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ফিরে আবার যাবেন “শিবঠাকুরের আপন দেশে”।

দুর্গাপূজো হোল শক্তির আরাধনা। সেই আরাধনার উদ্দেশ্য হোল, শুভ-শক্তি দ্বারা অশুভ অত্যাচারী শক্তিকে পরাজিত করে-শান্তি স্থাপন করা। শক্তির প্রয়োজন যেমন মহিষাসুরের অত্যাচারের সময় প্রাসঙ্গিক ছিল, তেমনি আজকের এই অশান্ত “হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে”ও প্রাসঙ্গিক। মায়ের কাছে পার্থনা করি সবাইকে যেন ভালভাবে রাখেন। পৃথিবী মনলময় হোক। পৃথিবীতে শান্তি আসুক।



বাগ্মী

ডাঃ দাস

(উনবিংশ শতাব্দির রুশ কথাসিদ্ধি আন্তন চেখভের একটি ছোটগল্পের কনস্টান্স গার্নেট-কৃত ইংরাজি অনুবাদ
'The Orator' থেকে বাংলায় অনূদিত। বাংলা অনুবাদ করেছেন ওয়েলিংটনের দিলীপ কুমার দাস।)

মনোরম এক সকালে মাঝারি পদমর্যদার এক সরকারী কর্মচারী কিরিল ইভানোভিচ ব্যাবিলনোভকে সমাধিস্থ করার তোড়জোড় চলছিল। সেই সময়ের দুটি ব্যাধির কবলে পড়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। ব্যাধিদুটির একটি হল দজ্জাল সহধর্মিণী আর অন্যটি অত্যধিক মদ্যপান। গির্জা থেকে বেরিয়ে শবযাত্রা যখন কবরস্থানের দিকে যাচ্ছিল তখন মৃতের এক সহকর্মী পোপলাভস্কি হস্তদন্ত হয়ে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ধরে তাঁর এক বন্ধু গ্রেগরি পেট্রোভিচ জাপোইকিনের খোঁজে ছুটলেন। জাপোইকিনের বয়স যদিও তেমন বেশী নয়, তবু এই বয়সেই বাগ্মী হিসাবে সে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। আমার পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে জাপোইকিন একটি বিরল প্রতিভার অধিকারী। বিয়ে, জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী জাতীয় কোন জয়ন্তী, মৃতকে সমাধিস্থ করা – এরকম যে কোন অনুষ্ঠানে সে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিয়ে মাত করে দিতে পারে। ঘুমের মধ্যে, খিদে পেটে, প্রচুর মদ গিলে মাতাল হয়ে বা ধূম জ্বরে – সব অবস্থাতেই সে বক্তৃতা করতে পারে। আর সে যখন বক্তৃতা শুরু করে কথাগুলো যেন কলের জলের মত গলগল করে মসৃণভাবে তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে। মাছিভনভনে রেষ্টোঁরায় যত মাছি থাকে জাপোইকিনের বক্তৃতা অভিধানে তার থেকে অনেক বেশী সুন্দর সুন্দর কথা মজুত থাকে। সে একবার বক্তৃতা শুরু করলে থামানো দায়। এমনও হয়েছে যে বড়লোক ব্যবসাদারদের বাড়ীর বিয়েতে তার বক্তৃতা থামাতে পুলিশ ডাকতে হয়েছিল।

তাকে বাড়ীতে পেয়ে পোপলাভস্কি বলল, “দোস্ত, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। হ্যাট-কোট চড়িয়ে এক্ষুণি আমার সঙ্গে চল। আমার জানাশোনা একজন মারা গেছেন। তাঁকে সমাধিস্থ করার সব আয়োজন সম্পূর্ণ। ইহলোক থেকে তাঁকে বিদায় দেবার বক্তৃতাটি তোমাকেই দিতে হবে। একমাত্র তুমিই সেই কাজের উপযুক্ত। চুনোপুঁটি কেউ হলে তোমাকে কষ্ট দিতাম না। কিন্তু তিনি ছিলেন সেক্রেটারী, আমাদের আপিসের একজন মুরগিব। একটা উপযুক্ত বক্তৃতা ছাড়া সেই মানুষকে সমাহিত করা শোভা পাবে না।”

– “ওহ্, সেক্রেটারী মারা গেছে, মানে সেই মাতালটা!” হাই তুলে বলল জাপোইকিন।

– “হ্যাঁ। ... ওখানে প্যানকেক থাকবে, লাঞ্চও থাকবে। ... আর তোমাকে ফেরার গাড়িভাড়াও দেওয়া হবে। আমার সঙ্গে চলে এস দোস্ত। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একটা জুৎসই বক্তৃতা দাও। খুব তারিফ করবে আর কৃতজ্ঞ থাকবে লোকে।”

জাপোইকিন সঙ্গে সঙ্গে রাজী হল। চুলগুলোকে একটু রুকখু-শুকখু এবং মুখটাকে একটু দুঃখী-দুঃখী করে সে পোপলাভস্কির সাথে বাইরে রাস্তায় এল। গাড়িতে উঠতে উঠতে সে বলল, “তোমাদের সেক্রেটারীকে আমি জানতাম – একটা ধূর্ত শয়তান – জন্তু। সচরাচর এমন লোক দেখা যায় না। যাক, এখন স্বর্গে গিয়ে সে শান্তি পাক।”

– “গ্রিশা, মৃত মানুষের নিন্দা করা ভাল নয়।”

– “অবশ্যই নয়। জানি, মৃতদের সম্বন্ধে হয় ভাল কথা বলবে, না হয় চুপ করে থাকবে। কিন্তু সে সত্যই একটা বদমাইস ছিল।”

তারা শবযাত্রাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। কফিনটা এত আস্তে আস্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যে সেটা কবরস্থানে পৌছনোর আগে দুই বন্ধুতে রাস্তায় তিনবার থেমে শুঁড়িখানায় ঢুকে মৃতের স্বাস্থ্য কামনা করে সামান্য একটু পান করে নিল। তারপর শব এবং শবযাত্রীরা সমাধিস্থলে পৌঁছলে কবরের পাশে অনুষ্ঠান শুরু হল। মৃতের স্ত্রী, শাশুড়ি এবং শ্যালিকা প্রথামত প্রচুর অশ্রুবর্ষণ করলেন। যখন কফিনটা কবরে নামানো হচ্ছিল তখন স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বলছিলেন, “আমাকে ওঁর সাথে যেতে দাও।” তবে বোধহয় পেনশনের কথা ভেবে তিনি নিরস্ত হলেন।

কাল্মাকাটি শেষ হয়ে আবার যখন সব নিশুপ হয়ে গেল তখন জাপোইকিন কবরের দিকে এগিয়ে গিয়ে উপস্থিত সবাইকে একনজর দেখে বলতে শুরু করল – “আমি আমার চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এই সমাধিস্থল, এই অশ্রুসিক্ত মুখগুলি, এই হৃদয়বিদারী বিলাপ – সবই দুঃস্বপ্নের মত নয় কি? কিন্তু হায়! এটা স্বপ্ন নয় – বাস্তব। আমাদের চক্ষুতো প্রতারণা করছে না। সেদিনও যাকে সতেজ, নির্ভীক, প্রাণোচ্ছল দেখলাম, যিনি মৌমাছীদের মত অক্লান্ত পরিশ্রমে মধু আহরণ করে দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করলেন, সেই মানুষটি এখন ধুলিধূসরিত প্রাণহীন মরিচীকা মাত্র। মৃত্যুর করাল হস্ত তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল এমন একটা সময়ে যখন বয়স হলেও তিনি ছিলেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর, সকলের আশাবরসার উৎস। তাঁর মৃত্যু একটা অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর শূণ্যস্থান কে পূর্ণ করবে? অনেক ভাল সরকারী কর্মচারী আছেন। কিন্তু প্রোফোকি অসিপিচ ছিলেন স্বতন্ত্র। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তিনি ছিলেন সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, নির্লোভ এবং পরিশ্রমী মানুষ। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। উৎকোচ তাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। যারা তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করত, যারা তাকে বিলাস উপকরণ উপটোকন দিয়ে কর্তব্যচ্যুত করার চেষ্টা করত তাদের তিনি ঘৃণা করতেন।

আমি নিজের চোখেই দেখেছি কিভাবে তিনি তাঁর স্বল্প বেতন দুঃস্থ সহকর্মীদের বিলিয়ে দিতেন। আর এখন আপনারা তো নিজেদের কানেই শুনলেন তাঁর বদান্যতার উপর নির্ভরশীল অনাথ এবং বিধবাদের বিলাপ। সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ এবং কর্তব্যপরায়ণ হয়ে তিনি সাংসারিক এবং জাগতিক ভোগবিলাসের আনন্দকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আপনারা সকলেই জানেন যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি অকৃতদার ছিলেন। এখন সাথী হিসাবে কাকে আমরা তাঁর শূণ্যস্থানে বসাবো? এখন আমি তাঁর সেই শ্মশ্রুশুষ্কহীন, সৌম্যসুন্দর, স্মিতহাস্যময় মুখটা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তাঁর মৃদুমধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। প্রোফোকি অসিপিচ! তোমার ক্লান্ত অস্থি বিশ্রাম লাভ করুক। হে মহান, সৎ, পরিশ্রমী মানব তুমি শান্তিলাভ কর।”

জাপোইকিন তার বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগল। এদিকে তার শ্রোতারা ফিসফাস শুরু করলেন। তার বক্তৃতা সকলকেই খুশী করেছে। কিন্তু বক্তৃতার বেশ কিছু অংশ তাঁদের অদ্ভুত ঠেকেছে। প্রথমত, শ্রোতারা বুঝতেই পারলেন না মৃতের নাম যখন কিরিল ইভানোভিচ, তখন বক্তা কেন বারবার ‘প্রোফোকি অসিপিচ’ বলছিলেন। দ্বিতীয়ত, সকলেই জানে যে মৃত ব্যক্তিটি পুরো বিবাহিত জীবনকালটি তাঁর ধর্মপত্নীর সাথে ঝগড়াঝাটি করে কাটিয়েছেন। সুতরাং তাঁকে অকৃতদার বলা যায় না। তৃতীয়ত, তাঁর বেশ ঘন, লালচে দাড়ি ছিল এবং কোনদিন তাঁকে দাড়ি কামাতে দেখা যায়নি। সুতরাং শ্রোতারা কেউই বুঝতে পারলেন না যে বক্তা কেন তাঁকে ‘শ্মশ্রুশুষ্কহীন’ বলে বর্ণনা করলেন। তাঁরা হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে চাওয়াচায়াি করতে লাগলেন এবং কাঁধ ঝাঁকালেন। এদিকে কবরের দিকে তাকিয়ে উৎসাহভরে বক্তা বলে চললেন, “প্রোফোকি অসিপিচ, তোমার সাদাসিধে, ভাবলেশহীন মুখকে অনেক সময় বোকা বোকা মনে হত। কিন্তু আমরা জানি সেটা ছিল মুখোঁস। তার অন্তরালে একটা সৎ, পরোপকারী, বন্ধুত্বপূর্ণ হৃদয় ছিল।”

শীঘ্রই শ্রোতারা বক্তার মধ্যেই কিছু আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। বক্তা এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে রইল। তারপর বেশ অস্বস্তিসহকারে এদিক-ওদিক তাকাল, কাঁধ ঝাঁকাল এবং হঠাৎ করে বক্তৃতা বন্ধ করে দিল। ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

সে পোপলাভস্কির দিকে ঘুরে তাকিয়ে নিচু গলায় তাকে বলল, “আমি বলছি সে বেঁচে আছে।”

– “কে বেঁচে আছে?”

– “কেন, প্রোফোকি অসিপিচ। ঐ তো সমাধিফলকটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।”

– “সেটাই তো ঠিক। প্রোফোকি অসিপিচ মারা যায়নি। মারা গেছে কিরিল ইভানোভিচ।”

– “কিন্তু তুমি নিজে আমাকে বলেছিলেন যে তোমাদের সেক্রেটারী মারা গেছে!”

– “কিরিল ইভানোভিচই আমাদের সেক্রেটারী ছিল। হাঁদা তুমি। সব গুলিয়ে ফেলেছ। প্রোফোকি অসিপিচ আমাদের সেক্রেটারী ছিল আগে। কিন্তু বছর দুই হল সে অন্য আপিসে বড়বাবু হয়ে বদলি হয়ে গেছে।”

– “তুমি একটি শয়তান। আমাকে আগে বলনি কেন?”

– “গোলমাল যখন করেই ফেলেছ, তখন চালিয়ে যাও। থামলে খারাপ দেখাবে।”

জাপোইকিন পুনরায় কবরের দিকে ফিরলেন। আগের উৎসাহেই থেমে যাওয়া বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন।

প্রোফোকি অসিপিচ, দাড়িগোঁফ কামানো একজন পুরনো কেরাণী, সত্যিসত্যিই একটা সমাধিফলকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বক্তার দিকে রেগে চোখ পাকিয়ে তাকাল।

মৃতকে কবর দিয়ে সবাই যখন ফিরছিল তখন অন্য কেরাণীরা হাসাহাসি করে জাপোইকিনকে বলল, “তুমি সব গুলেট করে দিলে! ... নয় কি? ... জ্যান্ত মানুষকে কবর দিয়ে দিলে হে!”

প্রোফোকি অসিপিচ খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে রাগতস্বরে বলল, “ছোকরা, ব্যাপারটা খুবই খারাপ করলে। তোমার বক্তৃতা মৃত মানুষের জন্য চলতে পারে, কিন্তু জীবন্ত মানুষের ক্ষেত্রে সেটি বিদ্রূপ ছাড়া কিছু নয়। আমাকে উদ্দেশ্য করে তুমি কি যেন সব বলছিলে – নির্লোভ, ... দুর্নীতি ছুঁতে পারে না, ... ঘুষ খায় না! ... এসব কথা জীবন্ত মানুষকে শুধু ব্যঙ্গ করেই বলা যায়। আর কেউ তোমাকে আমার মুখ নিয়ে লম্বা-চওড়া কথা বলতে বলেনি। সাদাসিধেই হোক অথবা কুৎসিত ভয়ঙ্করই হোক আমার মুখের ভাব নিয়ে সর্বসমক্ষে এসব বলার দরকার কি ছিল? ... এগুলো সবই পরিষ্কার অপমান।”

২৬ জুলাই, ২০১৪।

ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড।



RRK FOODS

SURESH
Director

687 Sandringham Road
Sandringham
Auckland

Phone: (09) 620 8685
Fax: (09) 620 8687
Mobile: (021) 109 5336

Email: sureshdeva@hotmail.com

Wishing you all a Happy Durgapuja & Dashera

A Noble Nobel Laureate: A Tribute to Amartya Kumar Sen

Srikanta Chatterjee

Introduction: The legend, the legacy and how much we really know

The 1998 Nobel Prize for Economics was awarded to the Indian economist Amartya Kumar Sen in recognition of his many path-breaking contributions to the discipline, but principally for his work in the field of welfare economics which is a branch of economics concerned with the concepts and measurement of human wellbeing. While the whole of India rejoiced at this unique international recognition of one of the country's greatest minds, not many, including some in the economics profession, are familiar with much of what Sen has contributed or why his contributions are considered so valuable. Many however are curious to know, as I realised on my recent visit to Calcutta at a time when the city was formally honouring its prodigious son. Indian newspapers and magazines, I noticed, have been doing a valuable job publishing mainly non-technical, easy-to-read, articles on Sen's work by economists and others. Some of Sen's own writings over the years have also been reprinted to give readers a taste of his intellectual depth and his wonderful felicity of expression in both Bengali and English.

I feel sure that there are many amongst our expatriate community who would like to know something about Sen's work and its relevance to the contemporary world. In this article I attempt this task, but I do so with a distinct sense of my own inadequacy. For even as one who makes a living as a professional economist, I feel that there is a lot in Sen's economics which I cannot adequately do justice to. Besides, in a 'popular piece' such as this, one has to be selective and non-technical. And that adds to the incomplete nature of one's assessment. Nevertheless, I try below to highlight some of Sen's major contributions in economics and related disciplines. It would require a braver and, certainly, more erudite author than me to attempt a comprehensive appraisal of Sen's prolific contributions in economics, economic history, ethics and philosophy.

Scarcity, choice and the conflicting human goals: The stuff of economics

Let me begin at the beginning. Because human wants are endless, but resources with which the wants are to be satisfied are in most cases limited, we have to make choices, and establish priorities. Economics as a discipline offers some logical principles to enable "rational" decisions to be made. The ultimate aim of most economic activities is to increase the amount of usable goods and services; but this has to be done in a manner that uses the least amount of scarce resources, and at as low an (average) cost as possible. The producers of goods and services are in business to make a profit, and their aim might be to maximise their profit; while the consumers

for whom the goods and services are produced would aim to derive as much satisfaction (utility) out of each unit of their spending as possible. These aims of the two groups in society- the producer and the consumer- might conflict. The producer would like to keep the costs down by paying less for the resources (including labour) to be used in the productive process, and to raise as much revenue as possible by charging a price which helps to maximise profits. The consumers who supply the labour and consume the goods and services being produced would like a high wage and a low price to maximise utility. To keep the system running smoothly, this conflict has somehow to be resolved. One school of economic thought, known as neoclassical economics, came up with the idea of a “perfectly competitive market” which is assumed to have many producers of an identical good, many consumers all with complete information about the goods on offer, costless entry and exit of firms into and out of markets. These assumptions, if fulfilled, guarantee that the producers are able to earn only a “normal” profit, labour wages are in line with each labourer’s contribution to the total output, and consumers are charged a price which is “fair”. The neoclassicists concede that the actual markets might deviate from this abstract model, but they also believe that, most markets, left to themselves, will, over a period of time, be able to resolve the producer-consumer conflict. This supposed long run tendency towards an equilibrium which is “just” forms the core of much economic theorising. There are many critics of this line of thinking, but it has nevertheless been the major influence on economic policy making in capitalist economies for over a century.

Rational Fools: Sen’s critique of neoclassical rationality

The idea of “rationality” which derives from this approach postulates individuals who know what they want in order to maximise their own satisfaction, and who pursue economic activities with the exclusive aim of achieving that objective. Such rational individuals interact with one another in the market place as buyers and sellers of goods and services. And prices, purchases and sales arise out of these encounters in a manner that keeps the system going. The role of individuals as social beings with a social awareness is not given any importance in this approach - individual self-interest being the guiding principle in economic decisions. Economists using this approach do accept that there is such a thing as *social* wellbeing, in addition to the wellbeing of the (rational) individuals comprising a society. But social wellbeing is considered to be the sum total of the wellbeing of individuals. Only by allowing individuals to maximise their own wellbeing independently therefore can maximum social wellbeing be achieved, according to this line of thinking.

In critiquing this rather narrow approach to economic thinking, Sen has drawn attention to two traditions of economics as an intellectual and practical discipline. One of these is the ethical tradition of political economy which emphasises the societal aspect of human values - how human beings in their economic activities should conduct themselves as social beings. The other tradition is what Sen has called “engineering” which deals with the methods and means by which an economy functions. The elegant theoretical foundations of modern economics are based mostly on the application of principles that are more engineering than ethical. They emphasise how things work in modern economies rather than how they *should* work -

the normative dimension - is thought to be unnecessary. And yet, the modern pioneers of economics derived their approaches from both of these traditions. Adam Smith, the eighteenth century Scottish political economist, who is widely regarded as the father of modern economic thinking, was a professor of Moral Philosophy at Glasgow University. His thinking on economic issues combines both the strands usefully.

As economics got more “technical”, the tradition of using mathematical ideas and techniques along the lines of the natural sciences such as physics became established. Economic problems started to be thought of as problems requiring a mathematical solution to be obtained by techniques such as maximising, minimising or optimising an economic relationship expressed in mathematical terms. While accepting that analyses based on such an approach has contributed to a clearer understanding of many complex relationships in economics, Sen, himself an outstanding theoretical economist, has lamented the departure of economic theory from its ethical roots. For him, the private self-interest and the social good are not necessarily conflicting. Indeed, in many cases they are complementary. He has demonstrated how a pure rationalist in the neoclassical sense could be seen to be acting foolishly from a social viewpoint. Hence his telling phrase describing such an economic agent as a ‘rational fool’! He has cited Marx, approvingly, in this context ...” the point is rather that private interest is itself already a socially determined interest...”

The logical sequence leading to individual welfare maximisation can be viewed as follows: an individual’s choice is based on what an individual seeks to achieve; the individual seeks to achieve maximum satisfaction; satisfaction depends only on what the individual consumes and how much. Sen has questioned each of these premises. An individual’s choice may be guided by considerations of not just himself/herself, but of others in his/her family, community or country; his/her satisfaction may depend not just on his/her own consumption, but on that of others too. One may even give up some of one’s own consumption so that someone else may have a bit more. Sen has termed the sentiments that cause people to act this way ‘sympathy’ or ‘commitment’ which are perfectly rational sentiments, and, acting on such sentiments, an individual may achieve greater satisfaction than being purely selfish.

From individual to social choice- the ‘possibilities’ and the ‘impossibilities’

The American economist Kenneth Arrow in a path-breaking piece of research in the early 1950s showed that translating freely expressed individual choices into social choice without violating one or other basic rule of democracy is impossible. Democratic societies must therefore accept social decisions that are ‘undemocratic’, i.e. not based on consensus. An implication of this is that the only viable system of social choice is one that permits individuals in society to exercise their preferences in free markets. The protagonists of the conservative free market system found this a powerful weapon to argue their case against those who preferred collective decision making. The sentiments that all government action is, at least, potentially ‘bad’, that the government that leaves the private citizen to ‘freely choose’ is the most enlightened - sentiments that came to gain so much following in the 1980s and 1990’s- are, philosophically, linked to the idea of individualism implied in Arrow’s theorem.

Sen criticised the theorem on the ground of its 'informational poverty' which makes its focus too narrow. For example, Sen points out that a society may have a grossly unequal distribution of income; but any redistribution in favour of the poor might be objected to by the rich. If such redistribution is still carried out, it becomes undemocratic. But if the society decides collectively how much inequality is 'acceptable', and carries out redistribution accordingly, decisions may be democratic based on majority voting. Sen also showed that Arrow's acceptance of the 'libertarian principle' that a change is only acceptable if at least one person benefits from it, and no one loses is faulty because it violates some fairly basic tenets of liberalism. In several strikingly original papers, Sen reconstructed social choice theory by rigorously establishing the conditions necessary for democratic decisions to reflect individual values in a society. His reputation as an outstanding economic theorist is based mainly on his work in this area which uses the tools of set theory and other forms of abstract mathematics. His work in this area has also challenged many accepted notions of mainstream economics, helping to make alternative notions worthy of attention.

Entitlement, rights and capability: the poverty of orthodox economics

Sen's reputation amongst non-specialists is probably based on his work on poverty and famine. Indeed, the Nobel Committee also made a special mention of his work in these areas. The very notion of famine is bound up with the idea of food shortage, ie less food than would be necessary to feed a population. Such shortages of food can be termed supply-failures, which may be caused by droughts or floods, for example. Sen has studied several major famines and found in each case no particular evidence of a significant supply failure. The Great Bengal Famine of 1943 for example took place in a year when the rice harvest, while somewhat lower than the average for the preceding five years, was actually some 13 p.c. higher than in 1941 when there was no famine. A similar situation was observed to prevail in the Ethiopian famines of 1973 and 1974, and the Bangladesh famine of 1974. So why did some 2 million people starve to death in the Bengal famine? Sen developed the ideas of 'entitlement and deprivation' to explain the apparent anomaly.

These ideas are based on the notion that the mere availability of food (or some other necessary item) is no guarantee in a market economy that everybody will have enough (or any) food to eat. Because the food has to be bought, the command over food will depend on how much purchasing power one has. By earning an income one can command food. If for some reason the opportunity to earn an income is reduced, some people will go without an income and therefore without an entitlement to food. Such deprivation can happen even if there was enough food in a society to satisfy the nutritional needs of all its members. Notice the increase in the number of people in a food exporting country like New Zealand seeking help at the food banks in recent years when increased unemployment and reduced social security benefits have deprived some people of their entitlements to food. In the war-time economy of Bengal, many economic activities in the rural areas were disrupted, causing some agricultural labourers and others to lose their incomes totally or partially. Added to that was the inflationary price increases caused by increased war-time expenditure.

The price of rice rose by more than the prices of some other goods such as fish, milk, cloth and so on. The entitlements of the sellers of these goods to rice therefore also declined. To earn extra incomes, many who did not normally work as agricultural labourers now joined this labour force, thus pushing the agricultural wages down, and causing further deprivation. All these factors combined to make hunger and malnutrition widespread in the rural areas of Bengal where many died in 1943 and 1944. The cities and the industrial areas fared less badly because the government set up a system of food rationing which satisfied the minimum cereal needs of the urban dwellers. When village folk started to migrate in large numbers to the cities in search of work and food, death due to starvation started occurring there as well, points out Sen.

These ideas may look simple, but they offer new insights into the causes of widespread human misery, sometimes in the midst of plenty. They also help emphasise the importance of government action in reducing the impact of famines and starvation. Sen goes on to point out that large scale famines do not occur in democratic countries because governments in such countries feel compelled to act since inaction may cost them their office! In a country where public opinion does not make an input into how the country is ruled, famines or large scale starvation may not bring forth public action. Sen uses the example of the widespread food shortage and famine during China's Great Leap Forward experiment of 1958-60 when many millions perished without any serious public reaction. In post liberation Bangladesh, likewise, the lack of democratic accountability made the terrible famine of 1974 possible. Indian democracy, despite its many shortcomings, has helped avoid famines of the magnitude experienced during British rule, and prior to it. Public action in democracies is a useful weapon against potential catastrophes like famine.

Sen went on to develop more satisfactory measures of poverty, inequality and human deprivation of other sorts. Poverty affects human capabilities, and that in turn perpetuates human misery. His work with Jean Dreze brings out the extent of inequality between males and females in society, and even within families. Even amongst the poor, Sen points out, women are much more disadvantaged than men when it comes to access to education, medical care and nutrition. The destitution of the poor women in the Indian subcontinent is so abject that they might as well not exist. Sen has persistently emphasised the importance of basic education and health care in the development of a country, drawing attention to India's relative failure in these areas against the better performance of countries such as Sri Lanka and China, for example. Even within India, he has found Kerala's success in these areas significant in the context of Kerala's achievements on many social and economic fronts.

The connections between property rights, human entitlements, ethical and legal foundations of societal arrangements have all found a place in Sen's relentless quest for justice in societies. Robert Solow, the eminent American economist and a Nobel Laureate himself, once called Sen "the conscience of our profession". Sen's wide intellectual interests, sharp theoretical mind, and genuine concern for the underprivileged have combined to make him an influential figure internationally. Through the efforts of the late Mahbub-ul-Haq, the former chief economist of Pakistan and a close friend of Sen's who worked closely with the UNDP, the UN has come to accept the Human Development Index (HDI) as an alternative measure of

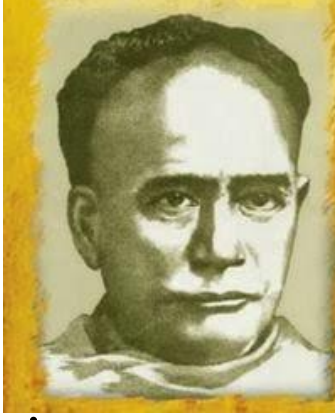
human wellbeing. This measure takes into account factors such as basic education, longevity as well as income per head in assessing the state of wellbeing of a country's citizens, and in ranking it internationally. The intellectual influence of Sen in the development of this concept is readily apparent.

The account above is about Amartya Sen, the economist and scholar. It would be inappropriate to conclude my tribute to my former teacher and revered friend without a mention of Amartyada, the person. I remember with pleasure and gratitude the many years when we had a close relationship as professional colleagues and friends. His (second) wife Eva was my colleague and a dear friend; his mother whom, we called Amitamashi, would visit us during her summer sojourns to London every year. The memory of the many happy gatherings at their home in Camden, London, and a few at our home in Surrey are still vivid, though tinged with sadnesses for the untimely death of Eva in the mid 1980s. Amartyada was always a warm, vivid personality who carried his scholarship lightly. A lover of good food, he would pay compliments to (my wife) Sandhya's '*muger dahl*' in particular, although Sandhya used to be hesitant to invite him because she felt that the great man's mind was on more serious matters, and we should not disturb that!

The memory of that walk we took with Amitamashi around London's Kew Gardens on a warm afternoon many summers ago listening to her reminiscences of Rabindranath, whom she called *dadamashai*, is still fresh in my mind. When visiting Santiniketan in early 1980, we were persuaded by my niece, who was a student there, to visit the Sen household. To our pleasant surprise, Eva and their two children Indrani and Kabir were also there. Amitamashi's mother, Kiranbala Sen was still alive, and I remember asking Amitamashi if we might offer her our 'pronams'. She went next door to alert her mother first, and, then, took us to her room where she announced "*Ma, dekho, era Bilet theke tomake pronam korte esechhe*". I felt abashed in the presence of that legendary lady, the widow of the scholar Kshitimohan Sen, who had lived through the evolution of that world-renowned institution bearing the name of its famous founder Gurudev Rabindranath Tagore. She sat up in her bed as we offered our 'pronams'. Touching our heads, she said 'it is good of you to come, Indira was here yesterday too'. She was referring to Indira Gandhi, then Prime Minister of India, and a former student of Santiniketan!

Well, that is enough of my own stories! The economist Amartya Sen is an object of admiration of all fellow economists. The person Amartyada is very much the man-next-door - approachable, delightfully witty and humorous, affectionate, helpful and generous. May he be spared many more years to continue his scholarly work.





"Education does not only mean learning, reading, writing and arithmetic, it should provide comprehensive knowledge. Education in geography, geometry, literature, natural philosophy, moral philosophy, physiology, political economy, etc is very much necessary. We want teachers who know both Bengali and the English Language, and at the same time are free from religious prejudices." - Ishwar Chandra Vidyasagar

ঐড়ে বাছুর

অমিত সেনগুপ্ত

ঠাকুরদাস কোমরগঞ্জে গেছেন মঙ্গলবারের হাটে। সুখবরটা তাঁকে অবিলম্বে দিতে হয়। রামজয় তখনই কোমরগঞ্জের দিকে হাটাপথ ধরলেন। পথেই ঠাকুরদাসের সঙ্গে দেখা। সুখরটা এক কথায় ভাঙলেন না। বললেন “একটা ঐড়ে বাছুর হয়েছে”। বাড়িতে একটা গোরুর তখন বাছুর হওয়ার কথা ছিল। ঠাকুরদাস ভাবলেন বুঝি সেই গোরুরটাই একটা বাছুর হয়েছে। তিনি এগোলেন গোয়াল ঘরের দিকে। রামজয় হেসে বললেন “ওদিকে নয়, ওদিকে নয়, এদিকে এস, ঐড়ে বাছুর দেখাচ্ছি”। বলে গোয়াল ঘরে না গিয়ে, ঠাকুরদাসকে নিয়ে আর এক ঘরে ঢুকলেন রামজয়। নব জাতককে (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) দেখিয়ে বললেন, “এই যে তোমার ঐড়ে বাছুর। ঐড়ে বাছুর বললাম কেন জান? এ ঐড়ে বাছুরের মত একগুয়ে হবে। যা ধরবে তাই করবে, কাউকে ভয় করবে না”। তার পর বললেন “ও হবে ক্ষণজন্মা, অপ্রতিদ্বন্দী এবং বিদ্যা ও দয়ার সাগর। ওর জন্য আমার বংশ ধন্য হবে। ওর নাম রাখলাম, ইশ্বরচন্দ্র”।

বিদ্যাসাগরের লেখা ‘বর্ণ-পরিচয়ের’ প্রথম ভাগে, গোপাল ও রাখাল নামে দুইটি ছেলের গল্প আছে। আজকাল বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরা বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণ-পরিচয়’ পড়ে না। তাই গোপাল ও রাখালের গল্প তারা অনেকেই জানে না। মনে হয় প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর হয়ে গেলো, বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরা, আর ‘বর্ণ-পরিচয়’ দিয়ে পড়াশুনা শুরু করে না, যা আমাদের সময় হত। আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও বর্ণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, এরকম প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে, গল্পদুটি জানত। দুটো ছেলেদের বলা হত রাখাল আর শান্ত-শিষ্ট ভাল ছেলেদের বলা হত গোপাল।

বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন,

“গোপাল বড় সুবোধ বালক। তার বাপ-মা তাকে যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরব বলে উৎপাত করে না। গোপাল যখন পড়তে যায়, পথে খেলা করে না। সকলের আগে পাঠশালায় যায়, নিজের জায়গায় চুপ করে বসে বই খুলে পড়তে থাকে এবং গুরুমশায় যখন যা বলেন মন দিয়ে শোনে।

আর গোপালের ঠিক বিপরীত হল রাখাল, যেমন দুটো তেমনি অবাধ্য। লেখাপড়া করে না, কেবল সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে। রাখালকে কেউ ভালবাসে না। বিদ্যাসাগর বলেছেন কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে সে লেখা-পড়া শিখিতে পারিবে না”।

বিদ্যাসাগরের চিন্তা হল লেখাপড়া শেখা, তাই তিনি গোপালের প্রশংসা করেছেন, যদিও ছেলেবেলায় তিনি রাখালের মতই দুটো ছিলেন, তবে লেখাপড়ায় তাঁর মন বরাবরই গোপালের মতই ছিল এবং তিনি যথেষ্ট লেখাপড়া শিখে মহাপণ্ডিত হয়ে, বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছিলেন।

আমাদের দেশে গোপালের অভাব নেই। গোপাল ও নাডুগোপাল পথে ঘাটে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। স্কুল-কলেজের গোপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপাল, অফিস-কাছারীর গোপাল, সংসারের গোপাল, নানা শ্রেণীর গোপাল আছে আমাদের দেশে। অবশ্য আজকাল রাখালেরও অভাব নেই। কিন্তু তবু ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, যে কোনও দেশের সমাজে গোপালের যা দাম, তার চেয়ে অনেক বেশী দাম রাখালের মত ছেলেদের।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বিদ্যাসাগর চরিত’ গ্রন্থে খুব সুন্দর ভাবে এই কথাটি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন “এই ক্ষীণতেজ বাংলা দেশে রাখাল ও তার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মত দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হলে, বাঙ্গালী জাতির শীর্ষচরিত্রের অপবাদ ঘুচে যেতে পারে। সুবোধ ছেলেরা পাশ করে ভাল

চাকরিবাকরি পায়, বিবাহকালে প্রচুর বরপন পায়। কিন্তু অবাধ্য অশান্ত ছেলেদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপে শচীমাতার এক অতি দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তার বহুকাল পরে বীরসিংহের ভগবতী দেবীর আর এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করেন। নবদ্বীপের নিমাই ও বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্র, বাংলার ইতিহাসের দুই যুগসন্ধিক্ষণের - দুই আদর্শ যুগপুরুষ”।

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র গোপালের মত সুবোধ বালক ছিলেন না, বরং রাখালের মতই দুরন্ত ছিলেন। যদিও লেখাপড়ায় তাঁর বরাবরই প্রবল আগ্রহ ছিল এবং এই একটি বিষয় ছাড়া সুবোধ বালক গোপালের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের কোন মিল ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে তিনি সনাতন সরকার নামে এক গুরুশাযের পাঠশালায় ভর্তি হন। সনাতন পণ্ডিত ছাত্রদের প্রহার করতে খুব পটু ছিলেন। দুরন্ত ঈশ্বরের পিঠে প্রায়ই সনাতনের বেতের দাগ দেখা যেত। ঠাকুরদাস তখন ভয় পেয়ে কালীকান্ত নামে অন্য এক গুরুশাযের পাঠশালায় ছেলেকে পাঠালেন। ‘বর্ণ-পরিচয়ে’ বিদ্যাসাগর লিখেছেন: “গোপাল যখন বিদ্যালয়ে যায়, পথে খেলা করে না, সকলের আগে পাঠশালায় যায়”। বিদ্যাসাগর কিন্তু নিজে কখনই তা করতেন না। পাঠশালায় যাতায়াতের পথে তিনি প্রতিবেশীদের নানা ভাবে উপদ্রব করতেন। যারা শুচিবাসুগ্রস্ত, তাদের দরজার সামনে ময়লা আবর্জনা ফেলে দিতেন, যাতে তারা দরজা খুলেই তেলে বেগুনে জলে ওঠে। প্রতিবেশীরা ভয় দেখালে তিনি মোটেই গ্রাহ্য করতেন না, বরং তাদের বিরক্ত করার জন্যে তাঁর জিদ আরও বাড়ত। বালক ঈশ্বরচন্দ্র যে ভাবে প্রতিবেশীদের জালাতন করতেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বিদ্যাসাগর চরিত’এ লিখেছেন, “বোধ করি বর্ণ-পরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারীও কখনও এমন কাজ করে নাই”।

তা ছাড়া শুধু গ্রামবাসীরা নয়, বেচারী গাছপালা পর্যন্ত বালক ঈশ্বরচন্দ্রের এই উপদ্রব মুখ বুজে সহ্য করত। পাঠশালার পথে পাকা ধানের শীষ, জবের শীষ, আম, জাম, কাঠাল, পেয়াড়া ইত্যাদি যাবতীয় যা ফল পাওয়া যেত, এইসব তিনি খেতে খেতে যেতেন। কখন যে পাঠশালায় পৌঁছতেন তার ঠিক-ঠিকানা থাকত না। একবার তো ধানের শীষ গলায় আটকে, প্রাণ প্রায় যায় যায় অবস্থা হয়ে ছিল। এমনই ছিল তাঁর দুরন্তপনা, যে ‘বর্ণ-পরিচয়ের’ রাখালের গুরু হওয়ারই যোগ্য। বীরসিংহের মাটিতে, মাঠে-ঘাটে, গাছের ডালে-ডালে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দৌরাগের পায়ের চিহ্ন চিরকাল আঁকা থাকবে এবং তাঁর সেই দৌরাগের পদধ্বনি চিরকাল শোনা যাবে। আজও শোনা যায়।

মেদনীপুরের বীরসিংহ গ্রাম দরিদ্র মেহনতী মানুষের গ্রাম। রাজা-মহারাজা বা জমিদারদের ভগ্নস্তুপেরও কোন চিহ্ন

সেখানে নেই। আছে গ্রাম বাসীদের মাটির ঘর। মাটির ঘরেই ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন এবং এই মাটির ঘরেই তিনি মানুষ হয়ে ছিলেন। বীরসিংহের গ্রামবাসীরা প্রধানত সেই শ্রেণীর মানুষ, মাটির সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ ও গভীর। কৃষক, জেলে, বাগদী এদেরই বাস বেশী বীরসিংহে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের বাস বিশেষ নেই। অধিকাংশ গ্রামবাসীই ছিল মাটির মানুষ, খাটি মানুষ। ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায় মাটির কাছাকাছি এই খাটি মানুষগুলির মধ্যেই বড় হয়েছিলেন, মানুষ হয়েছিলেন। চাষী-জেলে-বাগদীর ছেলেরা তাঁর খেলার ও দৌরাগের সঙ্গী ও সহচর। সেই কারণেই তাঁর চরিত্রে কৃত্রিমতার কোন চিহ্ন ছিল না, সহজ সরল ও বলিষ্ঠ হয়ে তিনি গড়ে উঠেছিলেন। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কপাটি খেলতেন, ডাঙাগুলি খেলতেন, কুস্তি করতেন। এই সব খেলতে তিনি খুব ভালবাসতেন। ভয়ডর বলে কোন কিছু তাঁর মধ্যে ছিল না। গ্রামে তখন ভূতপ্রেতের ও চোরডাকাতের ভয় যথেষ্ট ছিল। জীবন্ত বা মৃত কোনও ভূতেই তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন তাঁর ঠাকুরদাদা, রামজয় বন্ধোপাধ্যায়ের উপযুক্ত নাতি।

ঠাকুরদাদা রামজয় দিনে-রাতে যখন ইচ্ছা বনে জঙ্গলের পথে চলতেন। সঙ্গে থাকত একটা পাকা বাঁশের মজবুত লাঠি। পথের দুরন্ত বা বিপদ আপদ কিছুই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কাউকে সঙ্গে নিয়েও পথ চলতেন না। তাঁর এই মজবুত লাঠির আঘাতে শুধু চোর-ডাকাত নয়, বুনো ভাল্লুককেও তিনি জখম করেছেন। এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন তাঁর ঠাকুরদাদার যোগ্য উত্তরাধিকারী। রামজয় তাঁর প্রিয়তম: নাতিটিকে ধনদৌলত কিছু দিয়ে যেতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্রের দুর্জয় পৌরুষের মহৎ গুণটি উজার করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল এই দুর্জয় পৌরুষ। আর ছিল তাঁর দয়াশীলতা, যার আলোচনা আমি এখন করব।

বিদ্যাসাগর যখন বিদ্যাসাগর হয়েছেন, তখন এক সময় বিদ্যাসাগরের বীরসিংহ গ্রামের বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর তখন মা ভগবতী দেবীকে কোলকাতায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। মা তখন তাঁকে বললেন “যে সব গরীবের ছেলে এখানে খেয়ে বীরসিংহ ইন্সকুলে পড়তে যায়, আমি এখান থেকে চলে গেলে তারা কি খেয়ে ইন্সকুলে যাবে?”

বিদ্যাসাগর একদিন ভগবতীদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মা তোমার কী কোন গয়না পরবার ইচ্ছা হয়?”

ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন, “বাবা, অনেকদিন থেকে আমার তিনখানি গয়না পরবার বড় ইচ্ছা আছে। গ্রামের ছেলেদের জন্যে একটা দাতব্য বিদ্যালয় করে দাও, গ্রামের গরীবদের জন্যে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করে দাও, আর

গ্রামের গরীবের ছেলেদের একটা থাকা-খাওয়ার ব্যাবস্থা করে দাও। অনেকদিন থেকে এই তিনখানি গয়নার আমার বড় সাধ।”

মায়ের গয়নার সাধ বিদ্যাসাগর অপূর্ণ রাখেন নি।

দুপুরে বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও, ভগবতীদেবী নিজে সহজে খেতে বসতেন না। যদি কোন অতিথি এসে পড়ে। যদি কোন অভুক্ত গরীবমানুষ এসে দাঁড়ায় একমুঠো অল্পের জন্যে। যতদূর সাধ্য, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন তিনি। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেঁড়াতে তিনি, সকলের খোঁজ খবর নিতে। দুঃখীর জাত বিচার করতেন না। অবোধে রুগ্ন হাড়ি-ডোমের ঔষধ-পথ্যের ব্যাবস্থা করতেন। অনেক সময় সঙ্গে থাকত সাগু-মিচরি, এমনকি দরকারে তিনি নিজে রুগ্নীর বাড়ি গিয়ে পথ্য তৈরি করে দিয়ে এসেছেন।

ভগবতীদেবী গ্রামের গরীব চামাভুষোদের টাকা ধার দিতেন। যাদের কাছ থেকে সহজে টাকা আদায় হত না, তিনি নিজে যেতেন তাদের কাছে টাকা আদায় করতে। কখনও কখনও খুব রাগ করে টাকা ফেরত চাইতেন, বলতেন, তোরা যদি টাকা ফেরত না দিবি, তো আমি অন্য কাউকে কি করে ধার দেব? ভগবতীদেবীর রাগ দেখে কেউ কেউ তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টা করত, কেউ কেউ দু ফোটা চোখের জল ফেলে তাদের দুঃখের কথা জানাত, কেউ কেউ আবার বিদ্যাসাগরের নাম করে, ভগবানের কাছে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করত। ভগবতীদেবীর রাগ পড়ে যেত এবং তিনি বলতেন, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, যখন সুবিধা হবে তখন দিস। আহা রে দেখে মনে হচ্ছে আজ বুঝি তোদের কিছু খাওয়া হয়নি। আয় আয় আমার বাড়িতে আজ খাবি।” টাকা শোধ দিতে না পারায় কেউ কেউ যদি কেঁদে ফেলত, তো তিনি স্বান্তনা দিয়ে বলতেন, “অবস্থা ভাল হলে দিবি, আর না হয় না দিবি। তার জন্যে কাঁদিস কেন?”

অনেক মহিলার মধ্যেই দয়া-দাক্ষিণ্য দেখা যায়। কিন্তু ভগবতীদেবীর দয়ার মধ্যে কী একটা যেন অসাধারণত্ব ছিল। ভগবতীদেবীর দয়ার ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোন প্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াইশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপে সম্বর্ষেই স্থলিয়া ওঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাস্তবের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতীদেবীর হৃদয়, সূর্যের ন্যায় বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকিরণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংস্কারের অপেক্ষা করিত না।”

বিদ্যাসাগরের মা ভগবতীদেবীর দয়ার কথা এবং বিদ্যাসাগরেরও দয়ার অনেক গল্প-কাহিনি আমরা শুনেছি

এবং তা বাংলার ঘরে ঘরে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এই সব গল্পের ভিতর দিয়ে আসল বিদ্যাসাগরকে জানা যায়, বোঝা যায়।

বাপ-মায়ের প্রতি বিদ্যাসাগরের ভক্তির গল্প বাংলাদেশে প্রবাদের মত জনপ্রিয়। বাবা ঠাকুরদাস খুব সুপুরুষ ও সুদর্শন ছিলেন না এবং তাঁর স্বভাবও একটু রুক্ষম্বরগের ছিল। মা ভগবতীদেবী ছিলেন অপূর্ণ সুন্দরী এবং তাঁর স্বভাবও অত্যন্ত কোমল ও মধুর ছিল। কিন্তু তাঁর মর্যাদাবোধ ছিল খুবই প্রখর। এতটুকু আঘাত বা অপমান তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তবে দম্ব তাঁর ছিল না, কিন্তু তাঁর চরিত্রের এমন একটা সরলতা ও স্বাভাবিকতা ছিল যে বাইরে থেকে দেখলে দম্বের মত মনে হত। বিদ্যাসাগর তাঁর মায়ের চরিত্রের এই কোমলতা, মধুরতা এবং তীব্র স্বাভাবিকতা ও মর্যাদাবোধ পেয়েছিলেন। বাবার কাছে পেয়েছিলেন নিরহঙ্কার ও নিঃস্বার্থবুদ্ধি। আর তাঁর ঠাকুরদাদার থেকে পেয়েছিলেন তাঁর তীব্র তেজ।

তাঁর বাবা-মায়ের স্বভাবের মধ্যে পার্থক্য ছিল বলে মাঝে মাঝে সাংসারিক জীবনে মন কষাকষি হত। তবে তা বেশীক্ষণ টিকত না। ঠাকুরদাসের বাইরেটা রুক্ষ হলেও, ভিতরটা ছিল সহজ ও সরল। আর ভগবতীদেবীর বাইরেটা ছিল দেবীমূর্তির মত শান্ত ও প্রসন্ন, কিন্তু ভেতরটা ছিল তেজস্বী বিদ্রোহীর মতো। ঠাকুরদাসের সামান্য কথায় মাঝে মাঝে তিনি ভয়ানক অভিমান করতেন। ঠাকুরদাস যখন বুঝতেন ভগবতী রাগ করেছেন, তখন তাঁকে খুশি করতে ঠাকুরদাসকে বেশী কষ্ট করতে হত না। ভগবতী লোকজন খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। বড় মাছ দেখলে তাঁর রাগ অভিমান সব এক মূহুর্তে উড়ে যেত। তাঁর রাগ ভাঙ্গার এই কৌশলটি ঠাকুরদাস খুব ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন। গৃহিণীর রাগের লক্ষণ দেখলেই তিনি সব কাজ ফেলে হাটে অথবা জেলেদের কাছে চলে যেতেন এবং যে ভাবেই হোক একটা বড় মাছ জোগাড় করে গৃহিণীর ঘরের সামনে ফেলে দিয়ে বলতেন, “এই দেখ পুকুরের সব চেয়ে বড় মাছটা তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি।” কোথায় তখন রাগ। ভগবতীদেবী একগাল হেসে বাঁটি নিয়ে মাছ কাটতে বসতেন।

ভগবতীদেবীর দয়া ও সেবার কথা লিখতে বসিনি। তা অনেকেরই জানা আছে। তা ছাড়া তা লিখতে গেলে বড়সর আকারের একটা বই হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে, তাঁর মায়ের দয়া ও সেবার প্রভাব তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্রে বারে বারে দেখা গিয়েছে। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত একবার বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন; “বাংলাদেশের মায়েদের মত কোমল আপনার অন্তকরণ, প্রাচীনকালের মুনিঋষিদের মতো আপনার জ্ঞান ও সত্যদৃষ্টি, একালের ইংরাজের মতো আপনার অফুরন্ত কর্মশক্তি।” বাস্তবিক নিজের মায়ের মতো, এবং বাংলাদেশের মায়েদের মতো, কোমল অন্তকরণ ছিল বিদ্যাসাগরের।

সম্ভবত ভাষায় বিদ্যাসাগর ছিলেন অগাধ পন্ডিত, কিন্তু ইংরাজি বিদ্যাকে তিনি আতিথেয় বরন করেছেন। পোষাক পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বদেশী, কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর ইংরাজিয়ানা ছিল তর্কাতীত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ধর্ম-বিশ্বাসের বিষয় পরে আলোচনা করব। তবে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, ‘পরোপকার’ই বিদ্যাসাগরের পরম ধর্ম এবং তার উদাহরন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে বারবার দেখা গিয়েছে। কাউকে উপকার করার সময় তিনি শত্রু-মিত্র বিবেচনা করতেন না। তিনি বিবেচনা করেতেন যার উপকার করছেন তার প্রয়োজন আছে কিনা। অথচ ইতিহাসের নির্ভুর পরিহাস এই যে, যাঁর দয়া তুলনাহীন, যিনি দয়ারসাগর নামেও পরিচিত,–কত দীন-দুঃখীর অশ্রুজল যিনি মুছাইয়েছিলেন, যার অনুগ্রহে বাংলাদেশে সেই সময় অনেকে গণ্যমান্য ও পদস্থ হয়েছিলেন। বঙ্গের এই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও তেজস্বী ব্যক্তির অল্পে পরিপুষ্ট ব্যক্তির বংশধর (সেই সময়কার বাংলাদেশে) অনেকেই ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পরে তাঁর দুই মেয়ে ভিত্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯২৫ সালে ১৯-এপ্রিল ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ লিখেছে;

“শ্রীমতী বিধুমুখী বসু এম, বি (৯৩/১ হরিঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা) পত্রান্তরে এক মর্মান্বিতকারক কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁর তৃতীয়া ভগ্নী উভয়েই অত্যন্ত কষ্টে কালতিপাত করিতেছেন। তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর দান মাত্র ১৫ টাকায়, নিজের, কন্যার ও দুইটি দৌহিত্রের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। তিনি বর্তমানে কাশীতে বসবাস করিতেছেন, কারণ সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প। দ্বিতীয়তঃ তিনি সেখানে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও কিঞ্চিৎ আয় করিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার অবস্থা ততোধিক শোচনীয়; সংসারে তাঁর একটি পুত্র পুত্র ভিন্ন আর কেহ নাই। তিনি বর্তমানে তাঁহাদের পুরাতন মালীর গৃহে একটি বারান্দায় বাস করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা জনসাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে অগ্রসর হন, তখন কয়েকজন আত্মীয় তাঁহাকে সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এই লজ্জাজনক সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা কেহই কিছু সাহায্য করেন নাই। এই কারণেই বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও তেজস্বী ব্যক্তির কন্যা হইয়াও তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে হইতেছে। এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অল্পে পরিপুষ্ট ব্যক্তির বংশধর বাংলাদেশে অনেকেই আছেন। অল্পে পরিপুষ্ট না হলেও বঙ্গদেশে এমন লোক খুবই বিরল, যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী নন। অতএব আশা করা যায় প্রত্যেকেই সেই মহাপুরুষের স্মৃতি মনে রাখিয়া

তাঁহার সন্তানগণকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইবেন। যাহারা উপরোক্ত মহাদুর্দশে কিছু সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা শ্রীমতী বসুকে জানাইলে তিনি বাধিত হইবেন।”

১৯২৫ সালের ২১-এপ্রিল ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ মন্তব্য করেছে, “যিনি দয়ারসাগর বলিয়া পরিচিত,–কত দীন-দুঃখীর অশ্রুজল যিনি মুছাইয়াছেন, যাহার অনুগ্রহে বাংলাদেশে আজ অনেকে গণ্যমান্য ও পদস্থ, তাঁহার কন্যাদের এই শোচনীয় দুর্দশার কথা শুনিয়া বুক ফাটিয়া কান্না আসে। বাঙ্গালী কি বিদ্যাসাগরের কন্যাদের জন্যে কিছুই করিবে না? যাঁহারা বিদ্যাসাগরের প্রসাদে আজ ধনী ও পদস্থ, তাঁহারা কি এইবার একটু কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন না? বাংলার ধনী ও হৃদয়বানেরা এ ঘোর কলঙ্ক হইতে বাঙ্গালীকে মুক্ত করিবার জন্যে অগ্রসর হউন।”

১৯২৫ সালে ১০ জুন আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছে:

“ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা কুমুদিনী দেবী এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন। দেশের সুসন্তানরা আমাদের যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্যে আমরা দুই ভগ্নী কৃতজ্ঞ। ... আমরা এইবার বৃদ্ধিতে পারিতেছি যে, আমরা নিরাশ্রয় নহি, বরং এই ভাবিয়া সুখ পাইতেছি যে আমাদের বহু সহৃদয় সন্তান দেশে আছেন। আমরা সকলের উন্নতির জন্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।”

যাহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল, তাহাদের নামের ও টাকার অঙ্কের একটি তালিকাও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র নিজে কোনদিন ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবানের কথা কাউকে বলেন নি। তিনি নিজে বলেছেন–আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেব?

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস “তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বিষয় বুঝেছেন। ঈশ্বরের বিষয় না বুঝলে, তিনি আর পাঁচটি বিষয় কি করে বুঝলেন? ঈশ্বরের বিষয় যে বোঝেনি সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? কেমন করে বুঝলেন যে স্কুল খুলে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হবে? খ্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ বুঝলেন কি ভাবে?”

বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী বলতেন, “খর-মাটি-কাঠামো দিয়ে নিজ-হাতে যে ঠাকুর গড়লাম, সে আমাদের রক্ষা করবে কি করে?” বিদ্যাসাগরকেও অনেক সময় বলতে শোনা গেছে “ঈশ্বরকে ডাকবার আর দরকার কি? চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে, তখন প্রায় একলক্ষ লোককে বন্দী করলে। সেনাপতিরা এসে বললে, মহাশয় এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদেরই বিপদ আবার ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন চেঙ্গিস খাঁ বললে, ওদের

বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটার হুকুম হয়ে গেলো। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন। কিন্তু কই, একটু নিবারন তো করলেন না? তিনি থাকেন, থাকুন, ভাল থাকুন, আমাকে তো আর কামড়াবন না?”

দুনিয়ার যে একজন মালিক আছেন, বিদ্যাসাগর সেই রকম বিশ্বাস করতেন। তিনি নিজে যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনই চলতেন। কেউ পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, “এর বেশী বুঝতে পারিনি। কিন্তু এপথে না গিয়ে, ও পথে গেলেই স্বর্গে যেতে পারব, তাঁর প্রিয় হব, এসব বুঝিও না, কাউকে বোঝাতে চেষ্টাও করিনা। লোককে বুঝিয়ে শেষকালে কি ফ্যাসাদে পড়ে যাব? পরের জন্য বেত খেয়ে মরব?”

বেত খাবার গল্পটি বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব সুন্দরভাবে বলেছেন।

“মনে কর মরবার পর আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপটাপ করেছে। যখন প্রমাণ হলো, তখন ঈশ্বর হয়তো বললেন ওঁকে পঁচিশ বেত মারো। তারপর মনে কর আমাকে নিয়ে গেলো। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায্য করেছি; তার জন্যে বেতের হুকুম হোল। তখন হয়তো আমি বললাম কেশব সেন আমাকে এইরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার দূতদের হয়তো বলবেন, কেশবকে আবার ডেকে নিয়ে আয়। এলে পরে হয়ত তাঁকে বলবেন, “তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজেই ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি? ‘ওরে কে আছিস-একে আরও পঁচিশ বেত দে’। নিজেই সামলাতে পারিনা, আবার পরের জন্যে বেত খাওয়া !...” বিদ্যাসাগর বলেছেন-ধর্ম বড় জটিল জিনিস। আমি এ-বিষয় বড় কিছু বুঝতে পারিনা।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন-“বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন...”।

এর উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-“ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী।”

সুকিয়া স্ট্রিটে ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষের বাড়িতে বসে পাইকপাড়ার রাজবাড়ির জন্যে একখানা চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগর। লেখা হওয়ার পর চন্দ্রমোহন একবার চিঠিখানা দেখতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন-“তুমি যা ভাবছ, তা নয়, এই দ্যাখো, ‘শ্রী-শ্রী হরিঃ সহায়ঃ’ লিখেছি।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে কোন চিঠি পড়লে দেখা যাবে যে, তিনি সমস্ত চিঠিতেই হয় ‘দুর্গা স্মরণম’, ‘হরি স্মরণম’ ইত্যাদি লিখেছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কি চিঠিতে ঈশ্বরের নাম এইভাবে লিখতে পারতেন?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় “হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফাণ্ড”। এই ফাণ্ডের সাথে তিনি প্রায় চার বছর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ফাণ্ডের পরিচালন সমিতির মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেওয়ায়, এই ফাণ্ডের সাথে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এই সম্পর্ক ত্যাগ করার সময়, ফাণ্ডের পরিচালন সমিতিতে তিনি লেখেন, “এই ফাণ্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকলে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফাণ্ডের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি।”

ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির ভয়! ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কি ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির কথা এমন করে লিখতে পারতেন? এই চিঠিতেই তিনি মানুষের পরম ধর্মের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, “যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়াই, তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কৰ্ম্ম,...।”

বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম হয়, তখন ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে - একটি যুগ অস্ত যাচ্ছে আর একটি নুতন যুগের উদয় হচ্ছে। অস্তগামী মুসলমান বাদশাহী আমল ও উদয়মান ব্রিটিশ যুগ। এই যুগ সন্ধিক্ষণের সময় - আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে ও মানুষের মনে নানা দিক থেকে একটা সাড়া জেগেছিল। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে বাংলাদেশের কয়েকজন সুসন্তান অনুপ্রাণিত হয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন, রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দুজনেরই জন্ম সেকালের হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চলে। রামমোহন ছিলেন এক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সন্তান এবং বিদ্যাসাগরের জন্ম এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে।

পুত্রকে গর্ভ ধারণ করার সময় ভগবতীদেবী নানারকম রোগে ভুগে প্রায় উন্মাদের মত হয়েগিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের লোকের ধারণা হয়েছিল যে, ভগবতীদেবীকে ভূত-প্রেত ভর করেছে। কাজেই ভগবতীদেবীর ভূত নামাবার জন্যে ওঝাদের ডাকা হল। ওঝারা অনেক ঝার-ফুক করেও ভূত নামাতে পারল না। অবশেষে রোগ ধরার জন্যে ডাকা হল বিখ্যাত জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমনিকে। তিনি কোষ্ঠী বিচার করে বললেন- “এ কোন রোগ বা ভূত-প্রেত কিছুই নয়। মাতৃগর্ভে এক মহাপুরুষ আছেন। তাঁরই দিব্য জ্যোতির প্রকাশ হচ্ছে।” - শুধু বিদ্যাসাগর কেন, সমাজের অনেক অসাধারণ পুরুষ যারা, তাঁদের জন্ম ও বাল্যকাল সম্বন্ধে এই রকম অনেক অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে বিদ্যাসাগরের জন্মলগ্নে তাঁর ঠাকুরদাদা তাঁকে ঐন্ডে বাছুর বলে অভিহিত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি ছোট ‘আত্মচরিত’ রচনা করেন। তাঁর ঠাকুরদাদার এই কাহিনীর উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন:

“এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে আমি বাল্যকালে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। এই সময় তিনি সল্লিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া বলিতেন-ইনিই সেই ঐড়ে বাছুর, বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন, তাঁহার পরিহাস বাক্য বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার ক্রমে ঐড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।” – (এরপর বিদ্যাসাগর লিখেছেন) – “জন্ম সময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমাকে ঐড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃশ্চরশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর সময়ে সময়ে, কার্য দ্বারাও ঐড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন কথা প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন: “ভারত বর্ষে এমন রাজা নেই, প্রয়োজন হলে যার নাকে এই চটি জুতো সুদ্ধ পায়ে টক করে লাথি না মারতে পারি।” শিবনাথ শাস্ত্রী এই কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন: “আমি তখনও অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও করিতেছি যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের ভেজ এমনই ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগ্নের মধ্য।

পিতামহ রামজয়ের কথা বিদ্যাসাগরের জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে, বাস্তবিক ঐড়ে গরুর একগুঁয়েমিই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কোন কাজে যখনই তিনি বাধা পেয়েছেন, তখনই সেই কাজ করার জন্যে তাঁর জিদ আরও বাড়ত। ধূতি-চাদর-চটি পড়া, ছোট-খাট এই বাঙ্গালী মানুষটির মূর্তিটি বজ্রের মত কঠোর হয়ে উঠত। শিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং জীবনের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, তিনি যতই বাধা পেয়েছেন, ততই তাঁর সঙ্কল্প কঠিন হয়েছে। তাঁর ঠাকুরদাদার ঐড়ে বাছুর পরিহাস, তাঁর জীবনে বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই ভেজ ও মাধুর্যের কথা, আজকের দিনে যেন ভাবা যায় না, যে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। অথচ বাংলা দেশের এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সারা ভারতে ও পৃথিবীতে উদার ও বলিষ্ঠ মানুষের প্রতিমূর্তি হিসাবে ‘বিদ্যাসাগর’ ও ‘দয়ারসাগর’ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। আজ আমাদের বিশেষ করে তাঁকে সশ্রদ্ধ স্মরণ করা কর্তব্য।



পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতা ভগবতী দেবী

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি



রানী আকলিমা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্মার্কে জানে না, এমন বাঙ্গালী পাওয়া দুষ্টর। কিন্তু যারা জানেন না, তারাও জানেন computer এ google করলে তাঁর সন্মার্কে সকল তথ্য পাওয়া যাবে, কবিগুরু কেন বিখ্যাত এবং কেন তাঁর বৈচিত্র্যময় গুণাবলীর কোন কূল কিনারা নেই। আজ সেই কারনেই তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর আলোচনার ধৃষ্টটা করব না।

আমি এক সাধারণ জীবন ধারার অতি সাধারণ মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের গান গলায় ধারণ করেছি নিজেকে চেনার আগেই। নিজেকে যখন চিনতে শিখছি, তখন জীবনের সব কিছুকেই কবিগুরুর গানের ভিতর দিয়েই চেনার, জানার, দেখার চেষ্টা করছি। এই চেষ্টা যে কখন আমার জীবনযাত্রার সাথে একাকার হয়ে গেছে, তা হিসেব করে বলতে পারব না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন দর্শন, তাঁর প্রতিটি সৃজনশীল শিল্পমাধ্যমে দিনের আলোর মত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গান যখন করি, তখন মনে হয়, আমার একান্ত ব্যাথা, আনন্দ, দুঃখ-সুখের কথাই যেন তিনি লিখে গেছেন। আসলে তাঁর জীবনের সকল একান্ত অনুভূতি অপার হস্তে দান করে গেছেন মানুষের জন্য। বাঙ্গালীর চিন্তা-চেতনা ও রুচিকে এক অপূর্ব কাঠামো দিয়ে গেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের গান আমাকে কেন টানে তার কিছু কারন আমি বলছি। তাঁর প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি যেই প্রেম, স্রষ্টার প্রতি নিজেকে উজার করে দিয়ে, শূন্যতার যেই পরিপূর্ণ ভূষ্টির অনুভূতি এমন সহজ করে কি বলতে পেরেছেন আর কেউ? এত সহজ, এত সরল, আবার এত গভীর যে তাঁর সৃষ্টি আমি পাইনি আর কোন সাহিত্যে।

প্রকৃতি নিয়েই যদি বলি, যখনই প্রকৃতি পর্যায় নিয়ে কোন গান করি বা শুনি, গানটি যেন একটি চিত্রকল্প হয়ে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। সে বর্ষাই হোক বা বসন্ত। ওই যে আমার চিন্তা ও আত্মাকে তাঁর সৃজনী শক্তি দিয়ে গঁথে দিলেন, তাঁর আত্মার সাথে, হৃদয়ের সাথে, এর তুলনা আর কোথায় পাব? সকল দুঃখকে গান দিয়ে, তাঁর সৃজনী দিয়ে তিনি জয় করেছেন, ভয় আর দুঃখকে। আমিও আমার জীবনের হাফাকার থেকে রক্ষা পেতে, তাঁর গানকেই অবলম্বন করে বেঁচে আছি।

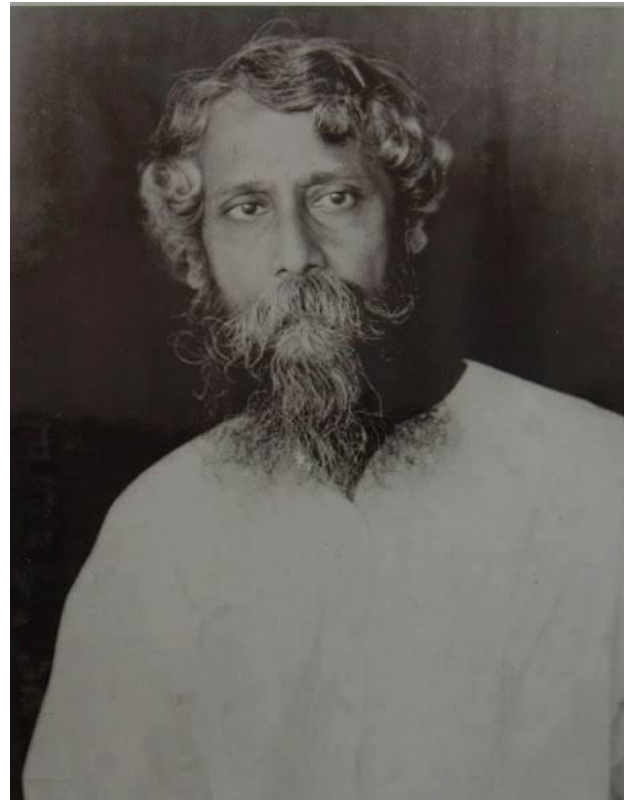
“কাল্লা-হাসির দোল দোলান পৌষ-ফাগুনের পালা, তারই চির জীবন বইব গানের ডালা।

এই কি তোমার খুশি আমায় তাই পড়ালে মালা, সুরের গন্ধ ঢালা?”

এই যে অকপকট স্বীকারক্তি, সহজ সত্য, যেন জলের মত। এর কি কোন তুলনা চলে?

আজ আমার জীবন আমাকে যেখানে নিয়ে এসেছে, কবিগুরুর গান জীবনে ধারণ করতে না পারলে, এতদূর আসতে পারতাম না। তাঁর গানকে আশ্রয় করে আমার জীবনকে যেন চালাতে পারি এই-ই প্রার্থনা। আমার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভয়-শোক সকল কিছুতে আশ্রয় আমার রবীন্দ্রনাথের গান।

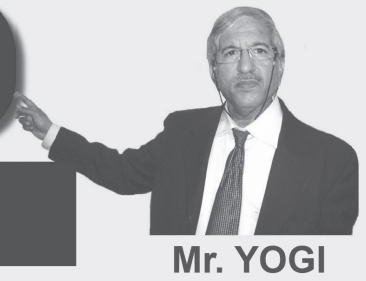
আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে যাঁরা আমায় সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন। যাঁরা ভালবেসে আমাকে গান গাইতে বলেছেন, তাঁদের কাছেও আমার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। আমার সাথে কবিগুরুর গানের জগতের সেতু রচনার পেছনে, আমার পরিবার, আমার সঙ্গীত গুরু রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, ডাঃ সনজিদা খাতুন এবং আমার পারি-পাশ্বিকতার অবদান অপরিণীম। আমি কৃতজ্ঞ স্রষ্টার কাছে, যিনি আমাকে বাঙ্গালী করে সৃষ্টি করেছেন। আমার দেশ, আমার সংস্কৃতি, আমার অস্তিত্ব যেন জীবনভর রবীন্দ্রনাথের দর্শনে সিত করতে পারি- এই আমার প্রার্থনা।



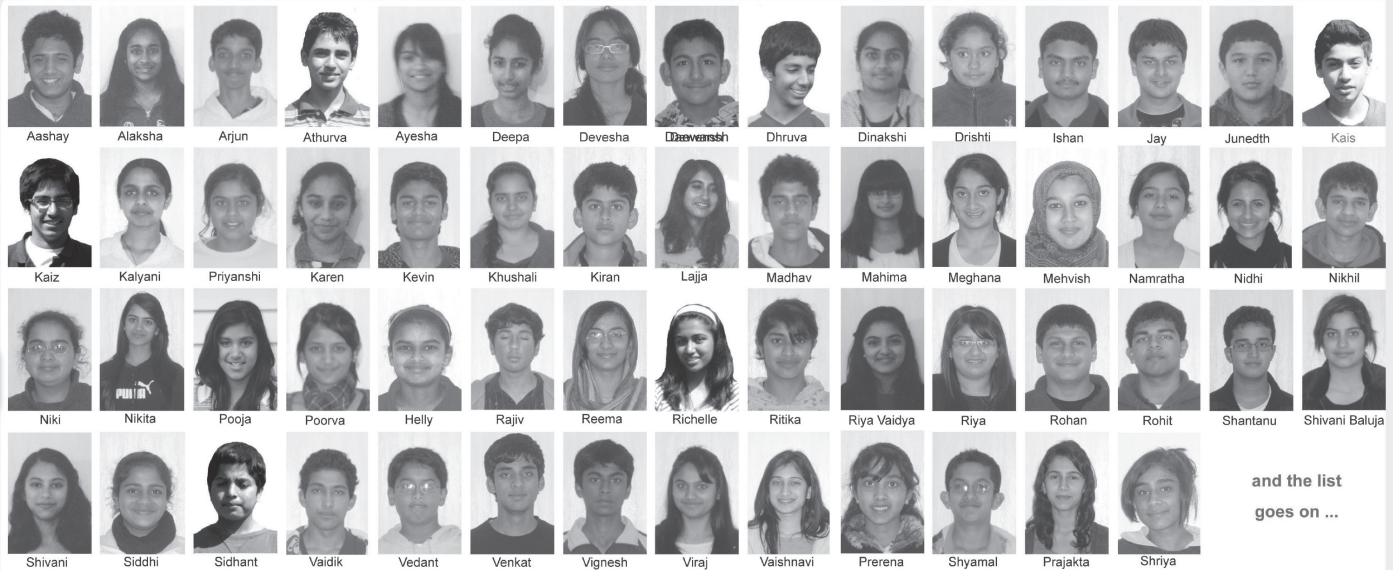
YOGI INSTITUTE

Maths: Year 3 to 13
Science: Year 9 to 11

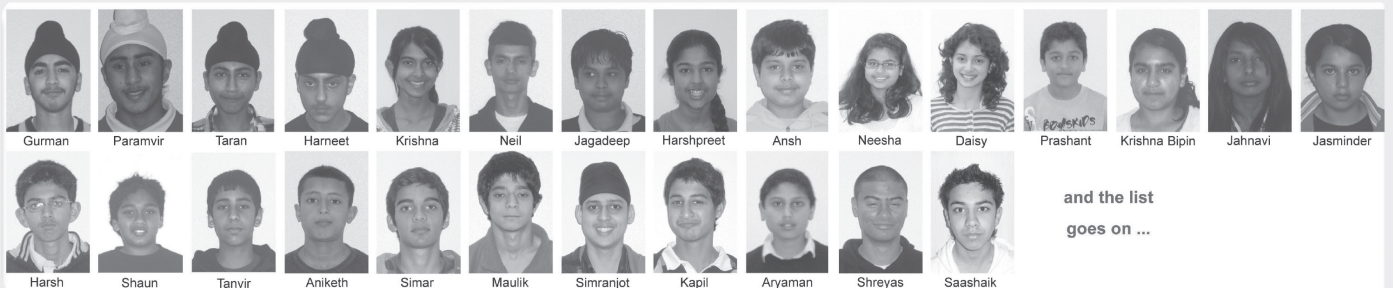
English: Year 3 to 10
Physics: Year 12 & 13



SHINING STARS OF MT ROSKILL BRANCH



FUTURE AND BUDDING STARS OF PAPATOETOE BRANCH (2 year old)



HOLIDAY COURSE FOR MATHEMATICS at Mt Roskill Branch (For Level 2, Year12)

Daily 3 hrs Classwork + 3 hrs Homework
Complete Curriculum covered during course

Dates: 10-10-11 to 22-10-11

Time: 9.00am to 12.30pm daily

Branch 1: Contact: Mr. YOGI Branch 2:

1/1 McGowan Street,
Mt Roskill, Auckland

Tel: 09 627 0070

89 Great South Road,
Papatoetoe, Auckland

Tel: 09 277 8039

Visit us at: www.yogiinstitute.com

রথযাত্রা, কার যাত্রা, কোথায় যাত্রা ?

তপন আচার্য

রথযাত্রা অর্থে রথে চেপে বিশ্বেশ্বর জগন্নাথের যাত্রা। সুশোভিত রথে উপবিষ্ট জগন্নাথের মূর্তিকে শত শত ভক্ত রথের রশি টেনে নিয়ে যায়। এটি একটি প্রাচীন উৎসব। রথে চাপিয়ে জগন্নাথকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়, কেন নিয়ে যাওয়া হয়, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই এই নিবন্ধ।

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুদের কাছে এটি একটি পবিত্র এবং পুণ্য অর্জনের উৎসব। দেশের তাবৎ ধর্মগুরু থেকে নেতা মন্ত্রী এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশী বিশিষ্ট জনরাও এই রথ যাত্রার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রথের রশি স্পর্শ করে বা রশি আকর্ষণে অংশ নিয়ে রথ যাত্রার অনুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করেন। কিন্তু কেন এই রথযাত্রা? এটি কি কোন প্রাচীন উপজাতির ধর্মানুষ্ঠান? কারণ কর্ণাটক ব্যতীত একমাত্র আমেদাবাদ, বঙ্গদেশে ও পুরীতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের বেদ, পুরাণ বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে এমন কোন রথযাত্রার উল্লেখ নেই। অথচ সুদীর্ঘকাল ধরে এই উৎসবটি পালিত হয়ে আসছে। রথযাত্রার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রা শুরু হয়েছিল। তার পূর্বে রথযাত্রার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বর্তমানে ইসকন্ আয়োজিত রথযাত্রা কলকাতা সহ বিশ্বের অন্যান্য শহরে দৃষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে এই রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেব আনুমানিক ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে। পরে তা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মাহেশের রথযাত্রা খুবই প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। কথিত আছে, স্বয়ং চৈতন্যদেব মাহেশের রথযাত্রার সূচনা করেন। এছাড়া বাঁকুড়াজেলার বিষ্ণুপুরে, মেদিনীপুর শহরে, গড়বেতা(পঃ মেদিনীপুর), মহিষাদল(পঃ মেদিনীপুর), বর্ধমান, ২৪পরগণা (উঃ ও দঃ) সহ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সমস্ত জেলায় কয়েক হাজার রথযাত্রা দিক থেকে উত্তর দিকে। শুরুর অষ্টমদিনে রথযাত্রা উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে হয়ে থাকে। তাই এটিকে উল্টোরথযাত্রা নামে বের হয়। বর্ধমানের কুলীনগ্রামের রথযাত্রারও সূচনা করেন চৈতন্যদেব নিজে। রথযাত্রা উৎসবটি সপ্তাহব্যাপী। রথযাত্রা শুরু হয় দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে। শুরুর অষ্টমদিনে রথযাত্রা উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে হয়ে থাকে। তাই এটিকে উল্টোরথযাত্রা নামে অভিহিত করা হয়।

রথযাত্রা উৎসবটি নিছক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনে করা হলেও, বাস্তবে এটি একটি প্রতীকি যাত্রা। আমরা জানি, বৎসরে দুদিন সূর্যের গতিপথ পরিবর্তিত হয়। এই ব্যাপারটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বলা হয়। উত্তরায়ণ অর্থে ছয়মাস ধরে সূর্য দক্ষিণদিক থেকে উত্তর দিকে যাত্রা করে। এই ছয়মাস ধরে দিনের পরিমাণ ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে। মকর সংক্রান্তি রেখাতে যেদিন সূর্য স্পর্শ করে সেইদিন দিনের পরিমাণ বৎসরের মধ্যে সব থেকে কম হয়। প্রায় ১০ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট।

তার পরদিন থেকে দিন বড় হতে থাকে। ঐ দিনটি প্রকৃতার্থে বড়দিন উৎসব। বড়দিন উৎসবটি বর্তমানে ২৫শে ডিসেম্বর উত্তর গোলাপার্শ্বের সমস্ত দেশেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে পৌষসংক্রান্তি দিবসের পর দিন থেকে বড়দিন শুরু হোত। ঐদিন থেকে সূর্য দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাত্রা শুরু করে এবং উত্তরায়ণ শুরু হয়। এই উত্তরায়ণের দিকে যাত্রার দিনটি আরো আগে, প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্বে দোলযাত্রা নামে পালিত হোত। যেহেতু ফাল্গুন মাসের উৎসব, তাই দোলযাত্রা উদ্‌যাপিত হোত শ্রীকৃষ্ণের ফাগ বা রঙের উৎসব হিসাবে। এভাবে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ শুরুর দিন দুটিকে সূর্যের দোলায় আরোহণ রূপে দোল ও ঝুলন যাত্রা নাম দিয়েছিল। তারপর প্রায় ৪০০০ বৎসর পরে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব উপলব্ধি করলেন, প্রাচীন মতের ঝুলনযাত্রার দিন অর্থাৎ দক্ষিণায়ণ যাত্রা আর শ্রাবণপূর্ণিমাতে হয় না। এটি হয় আষাঢ় মাসে। তখন তিথি ছিল শুক্লাদ্বিতীয়া। সুতরাং আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি নির্দিষ্ট হল দক্ষিণায়ণ শুরুর দিন হিসাবে। উৎসবটির নাম দিলেন রথযাত্রা। যেহেতু মহাপ্রভু তখন নীলাচলে, তাই রথের দেবতা হলেন

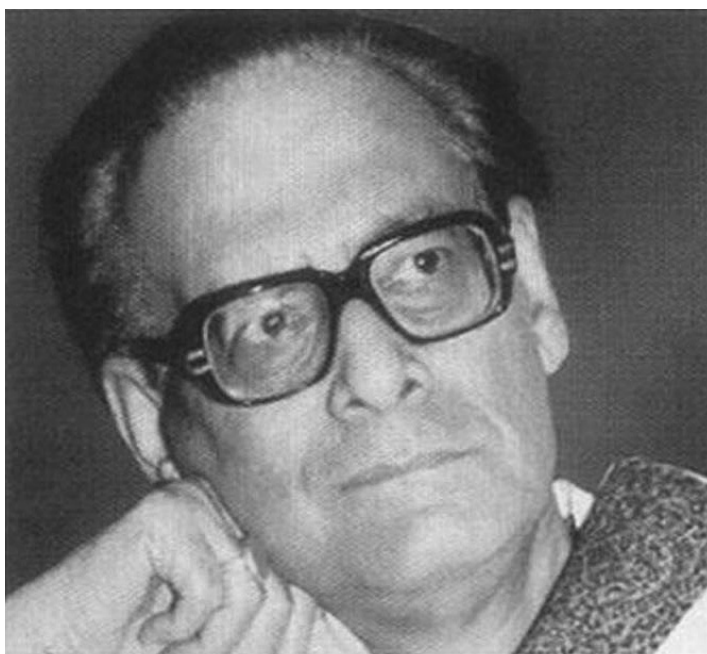




চলেছে। চৈতন্যদেব দক্ষিণায়ণ যাত্রায় বা রথযাত্রায় কৃষ্ণ দেবতাকে স্থাপন না করে পুরীর জগন্নাথ মূর্তিকে স্থাপন করেছিলেন। আজও সেই প্রথা কোন সংস্কার ছাড়াই অনুসৃত হয়ে আসছে। সূর্যের অয়নচলন বশতঃ ৫০০ বৎসরে প্রায় ৭ ডিগ্রী পিছিয়ে গেছে। হিন্দুদের ধর্মকর্ম গুলি তিথি ধরে করা হয়। তাই গৌরাজ প্রবর্তিত রথযাত্রার দিনটি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে তিথি হিসাবে। এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে দক্ষিণায়ণ শুরুর দিনটি নির্দিষ্ট হয়েছে ২০ বা ২১শে জুন। সুতরাং এখন শ্রাবণমাসের ঝুলনপূর্ণিমা উদ্দেশ্যহীন হয়ে গেছে। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত রথযাত্রার দিনটি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তিথি হিসাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত কখনই নয়। কারণ তিথির হিসাবে ৩৫৪ দিনে বৎসর হয়। কিন্তু পৃথিবীর সূর্যকে আবর্তন গতি ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট। তাই তিথির হিসাবে যে কোন অনুষ্ঠান বা উৎসব পালনের দিনটি কখনই সঠিক হয় না। এই কারণেই দুর্গাপূজা সহ সমস্ত পূজাপার্বণের দিন প্রতি বৎসর ১০/১১ দিন এগিয়ে আসে এবং প্রতি তিন বৎসর পরে একটি মাসকে (জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাস) মলমাস আখ্যা দিয়ে সমস্ত ধর্মকর্মানুষ্ঠানের দিন একমাস পিছিয়ে দিতে হয়। আমাদের ধর্মীয় উৎসবের সব কর্মের সংশোধন হয়নি। যেমন দোলযাত্রার দিনটি এখন বড়দিনে রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও এই বড়দিনটি এখন ২৫শে ডিসেম্বর নয়, ২২শে ডিসেম্বর। রাসযাত্রা



মধ্যবর্তিনী রাধার উপাসনার দিন। কৃত্তিকা নক্ষত্রকে প্রথম নক্ষত্র ধরে মধ্যবর্তী নক্ষত্র বিশাখা নক্ষত্রে যখন সূর্যের বিষুবমিলন শুরু হল, তখন ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরী হলেন রাধা। শ্রীমতী রাধা অর্চিতা হলেন রাশিমন্ডল মধ্যবর্তিনী রূপে। কিন্তু পরবর্তী কালে, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত আদি রসাত্মক বৈষ্ণবকাব্য রচনার যুগে, রাশিমন্ডল মধ্যবর্তিনী রাধা রূপান্তরিত হলেন রাসেশ্বরী রাধারূপে। রচিত হল শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেমলীলা। সূর্যস্বরূপ ঈশ্বরকে নিয়ে এই কদর্য ভাবনার প্রকাশ পৃথিবীতে আর কোন ধর্মে হয়নি। এত দীর্ঘকাল এত বড় একটা জাতি যে হীন দীন পরাধীন জাতি হয়ে কাটিয়ে ছিল, তার কারণ অবশ্যই ধর্মের অবক্ষয়। এখনও আমাদের ধর্মাচরণে অজ্ঞানতার অন্ধত্ব পথভ্রষ্ট করে রেখেছে। এখন প্রয়োজন সংশোধনের। শ্রীচৈতন্য সংশোধন করেছিলেন। তারপর আর সংশোধিত হয়নি। সূর্যের বিষুবমিলন তত্ত্বটি সঠিক ভাবে পালন করে জাপান (২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এই দুটি দিন তারা ১৯৪৮ খ্রীঃ থেকে জাতীয় ছুটি হিসাবে পালন করে) আজ উন্নতির শিখরে। এই তত্ত্ব ভারত সরকার দ্বারা ১৯৬২ খ্রীঃ থেকে অনুসৃত হলেও ভারতবাসী তা আজও গ্রহণ করেননি। এই প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি তিথি হিসাবে নয়, প্রয়োজন সূর্যের অয়নচলন গতি কে অনুসরণ করা। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখেনা, রথযাত্রার দিনটি যেহেতু সূর্যের অয়নগতি নির্ভর; তাই কোন তিথি নয়, দক্ষিণায়ণ শুরুর দিনটিকেই রথযাত্রার দিন হিসাবে পালন করতে হবে। আর রথের দেবতা হবেন অর্যমা। কারণ ১৯৯৮ খ্রীঃ থেকে ঈশ্বর অর্যমা নামে উপাসিত হচ্ছেন। পরের বৎসর থেকে দক্ষিণায়ণ শুরুর দিন থেকে (২০ বা ২১ শে জুন) অর্যমার রথযাত্রা করুন, তাহলেই আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।



Hemanta Mukhopadhyay

Kritibas Dasgupta

Hemanta Mukhopadhyay, to me, has always been the voice that carries a breath of romance but laced with a touch of melancholy. A controlled release of emotion is how I have always interpreted his singing. Whether it be the ode to the tortured soul in “*Emon ekta jhor uthuk*” or etching out one’s fantasy in “*Shono kono ekdin*”- he always sounded as though he was holding back, something deep inside. His rich baritone lent weight to that perception of depth, of course. However, it is his creative abilities as a composer that never ceases to amaze me. Hemanta practically ruled the Bengali Film Music scene for over 4 decades, however, his output of non film songs is no less extraordinary. His success as an MD is of course due to the hummable nature of his tunes which resonated very strongly with the listeners’ sensibilities, while planting enough seeds in there to ensure that the songs stood proudly up to the test of time. The bageshri that he weaves effortlessly into *Jhor Uttechhe Baul Bataash*, for example. The other amazing aspect of the man was his consistency. From Shapmochan to Amar Geeti, there are enough gems to last a lifetime. He churned

out memorable scores every year as a matter of routine, and it would be foolish to even try to list them, but a random sample can come up with *Lukochuri*, *Shesh Porjonto*, *Monihar*, *Baaghini*, *Anindita*, *Dadar Kirti*, and I just rattled off these names off the top of my head. And he lent his voice to the whole spectrum of matinee idols- from Uttam to Tapas Paul and everyone in between. His voice: Salil Chowdhury put it succinctly – “If we could hear God sing, He would be singing in Hemanta’s voice”. I have already alluded to this strange depth in his voice that always seemed to all the emotion that was possible to be expressed through the words of the song. When he sings “*Shobai chole geche*”, you can literally feel the emptiness & desolation inside you. When he croons “*Aro kache esho, jay je boye raat*”, the intimacy of the moment seeps out of the speakers & takes you into its cosy embrace. And then there is the absolutely timeless “*Jodi bhabo, eto khela noy*”. Where do we start & where do we finish. Helped immensely by top class lyricists, Hemanta Mukherjee created a body of work that is truly eternal in its appeal.

Best
Compliments and
Greeting for Dashera
from
Ashwani Singh
Mid City Liquor



691 Sandringham Road, Sandringham 1041, Auckland Ph: 02108142347

The Fund Manager Dada

Tapan Das

Nomoshkar, I am Robinsen Bonar. I'm a '*pret-manob*.' No, I am nothing like those Hollywood-designed ghastly looking Halloween weirdoes called zombies. Neither do I eat brains. I look like an average, non-descript potbellied *Bangali* with oil-sleeked side-parted hair, powdered back-of-neck, with an all-purpose *rumal* in my pocket. I just happen to hold dual citizenship: of human world and of spirit world.

Yes yes, I know what's on your mind. I am lucky. I am one of the chosen few. But to be honest, I have visited the spirit world only twice before: mainly because the immigration officers at the entry ports are a pain in the neck. "Why are you visiting? "Whom will you visit?" "What have you brought with you?" "We will have to check all your recent updates on social networking sites first": they take the pleasure away from trips. But I do visit them virtually on our networking sites: '*chayakhata*' and '*spiritweet*.' Such fun that is. I get to follow all the stars and divas of my dream: Uttam, Suchitra, Manna, Rituporno...my friend list glows with glamour! Just a few months ago, Uttam da posted on '*chayakhaata*' that thank goodness that Suchitra and he had already exited the human world, or they too would have been sent for election campaigns to Birbhum Bankura and what not, in the blistering summer heat. I quite like following their updates on social networking sites. I even got a ticket to a Manna Dey-Jagjit Singh concert recently. This is something that I indeed enjoy of my dual citizenship. I have always looked forward to a post-retirement permanent residence in the spirit world.

But right now, I am in a terrible mess.

I was tugging at a piece of lamb meat at lunch this afternoon, trying to ease the meat off the bone when suddenly the marrow from the bone shot up my windpipe in rocket speed. I choked. Before Reema, my wife, could come and do something to revive me, I had stopped breathing. Now this was a very different feeling. I felt light as air, floating around like a formless, transparent scarf. I understood that my body was completely separated and I was now only a soul. I felt myself sitting on the fan blades (my goodness! Who knew the blades had gotten so dirty and grimy even after the massive cleaning done a month ago!) looking down at my open-mouthed body, still grabbing the culprit bone in gravy-sodden fingers. Reema ran out to find help and in the meanwhile, I just thought I'll make a quick visit to the other world and then when Reema gets back with the doctor, I will slip quietly back in within my earthy form. But now I am in trouble. Reema got back, along with a doctor and some neighbours. Soon Jimmy, our son, joined the howling, head-banging crowd of mourners too. I hurriedly tried to get back into my body, but I failed. Now I panicked. This has never happened before! I had always been able to leave the body for a while and visit the other world, but could always get back in.

Much that I enjoyed being '*dual-spirited*,' I wasn't yet ready for a final exit from the human world. And now of all days! It's *pujo* in a month and I am the convener of the purchase committee of our *Club pujo*. These boys will all be lost without me, their favourite '*Angrez da*', as I am called by them at times! Not to say anything of missing the nabami feast and the post-dashami bijoya feasts that are supposed to keep me occupied for a month. And then there is Reema – I can't possibly leave her all by herself yet. We are a team, a rocking one. Our partnership has been stuff of movie plots: conservative Brahmin girl marrying an '*Anglo*' against the wishes of the Chabi Biswas-type patriarch in the family made quite a sensation those days. Even before the dust on such a marriage had settled down, we kept popping up in

conversations in the hood: for our polar difference in temperament, yet the fevicol-bond we shared. I am outgoing and thrive on social interactions and participation. She gets tired of too many people around her. So each time that I have stood in the elections in the past thirty years, Reema campaigned against me and requested people to not elect me, so she could ensure that I spent more time with her and Jimmy. Without fail, every evening I would bring home something special for her and she would cook something fingerlicking good for me, to go with hot chapattis. A few pegs of 'Old Monk' have always done the trick for me. Rafi, Manna Dey, Shakti Chakraborty, and Ezekiel would all come flooding my sensibilities. Countless evenings I uttered my favourite lines pointing to my wife and son:

'I am standing for peace and non –violence

Why world is fighting fighting,

Why all people of World

Are not following Mahatma Gandhi,

I am simply not understanding.

Ancient Indian Wisdom is 100% correct.

I should say even 200% correct.

But modern generation is neglecting-

Too much going for fashion and foreign thing.'

I can't deprive her of my company so early, so much without preparation.

I was feeling very dejected that I would not be able to be a part of the grand Puja celebrations, I was supposed to take up the role of 'Heramba babu' in our club drama, 'Lord Cornwallis'er Chata'. I had planned to enjoy the Bombay night with my friends sitting in the first row with the VIPs and even have Shankar Panda's 'LuchiMangsho' at his stall. Alas! What can I do now?

I thought fondly of my *tentultala addas*. As coffee House was to Moidul and D'souza, *Tentultala* is to me. From self-composed sher o shayaris to lines from The Beatles, from trifolia street lamps in Kolkata to the Telengana issue, Intensive survey, Indranil's mind boggling souvenir and memorabilia collection, or our Choto Shakeel's sher o shayeri, our adda has always been my lifeblood. The past few days we had been so incensed with the ebola virus that it formed most of our two/three hour adda sessions. Besides, my tentultala buddies have been my support system always. From kids' career and admissions and jobs to each other's health and hobbies, from puja planning to winter picnics, planning newer ways of membership induction drive, Football, Cricket, we tentultala buddies are always living the shared experience of life where age is considered just a number. The spirit world can never provide me with such fulfilling tentultala experience, I'm sure!

Most of all, I had a score to settle with Haripal Bhatta of our *pujo* committee. He has always been mad at me for not letting him pocket extras from the *pujo* fund. His disappointed comments were peppered with 'Oh shit' without the 'h'. 's[h]it Robin babu, you are just always messing up my plans. Oh S[h]it! You are such a bummer!' But I have always managed to keep him checked. This time, I suspect he is up to something big trick, just to get at me. How can I go away and let him win? *Maa, oshoter joy hotedionaamaa, Bhattaashurke aamaay thanda korar chance daao, maa*, I implored in despair as I

looked at my shroud covered body and the queue of mourners coming in to drown me in more and more flowers and garlands.

I just had to sort this mess out. I just *have* to get back in my human body.

I reached the citizenship office of the spirit world and demanded explanation, but the bored-looking *pret*-clerk, who kept playing solitaire on the computer even as I spoke, eyed me suspiciously for arriving from earth, tested me for ebola, and just asked me to 'file a complaint.' Indignant, I vented it all out on chayakhaata and spiritweet. In a minute, my post had 90 'likes' and several consolatory messages. But nothing to resolve my issue! Dejected, I hit the bar. At least here 'Babaji marka amrit,' a version of *somras*, was free and of unlimited supply – this cheered me up a little. Floating by, I came across several spirit rehabilitation centres. In an open window I spotted our unique moustache man Virappan dada, doing mandatory community service as part of the criminal correction and rehabilitation plan: burning chunks of sandal wood to circulate sandalwood smoke through the spirit world. Hmmm, not bad, I thought. I also saw several young lads, may be in their early twenties, looking after infants and toddlers. I spent some time watching them, curious about the type of correctional therapy they were undergoing. Finally it dawned on me: on earth, they had been hanged for being guilty of rape. Here in this spirit world correctional facility, they are being made to 'mother' a child: they were being made to do all that a mother has to do to take care of a child. This way, by doing selfless acts of care and service as mothers do, they are learning empathy, learning to respect others and themselves.

I wandered along, still feeling restless. I peeped back at the human world and saw that the fight over my body was still on. I tried shoving all *horidaspaals* out and tried whispering in Reema's ears but could do neither. I felt helpless. Floating by in the spirit world, looking for a solution or at least an explanation, I bumped in to a small group of people gathered under a tree. Had to be a Bong gang, I thought to myself! Look at those steaming cups of cha and cigarettes between fingers and the rising voices on *didi's* politics and future of Congress, this club, that club, Brazil, Germany and Bharat Ratna. I could even hear a passionate rendition of 'Abanibariaaacho?' It reminded me so much of tentultala and our gang. As I went closer, I suddenly felt a sharp jolt of pleasure! So many long-gone known faces! Ramu da, Jeevan da, Sengupta da, Sreegupta da, Chatterjee da, Bose da, Maity da, Dutta da, Sen da, Das da, Lahiri da, Ghosh da, Chanda da, Mukherjee, Mondol Saheb, Ahmed miyan! They waved at me as soon as I approached.

"Arrey Robin! You here too, finally?"

"Bonar babu! What a pleasure!"

"Tumikobe ele Robin bhaya? Just the other day I saw you campaigning for elections. Did you win?"

I was pumped by these hearty comments of welcome and recognition. I told them my story. Suddenly, they were all rather quiet, eyeing each other knowingly. I sniffed a rat. But they didn't say anything on this anymore. Mukherjee and Bose da took me to a meeting that evening, which turned out to be a spirit world *pujo* committee meeting. I wasn't surprised, because it was festive season, and I knew the spirit world celebrated all festivals: from Navroze to Durga puja to lantern festivals. This was truly one world. I had learnt so much about world festivals from pictures and updates in Chayakhata. But this time, I was not quite in the mood. So I floated around half-heartedly, sad about the festivities I was missing on earth. And now it is too late, I realised. Too late to go back. My body was already being cremated. I read some of the messages people had posted on my Facebook page.

The messages suddenly flared me up again. This is after all a technical fault on the part of the spirit co-ordinators! I wasn't supposed to be permanently up here as yet. I was to be given a day's notice at least, as per the rule book *pret-manobs*. I felt angry but it was frustrating because I had no body now. So I couldn't ball up my fist, couldn't kick, couldn't push or scratch or pinch or punch.

Just then, Bose da whispered in my ears: “Don’t be upset about being brought without notice. We always wanted you up here on a permanent basis to manage our festival committee funds, you know. In the recent years funds have been really mismanaged. I read on Spiritweet how skilled you are at fund management and we know how you have been keeping that man ‘Haripal Bhatta’ at bay in human world all these years. So who better than you? So we asked spirit hackers to program your dual spirit account in such a way that as soon as you make a visit here, your return function will be locked, so you can stay here forever. And we will hold an election here and I can assure you that I have hold on a large voter bank. You WILL win the post of fund manager, I can tell you.”

“Elections here too?!Really?”

“Yes absolutely. It has to be a democratic choice after all. You don’t expect our community to just place someone in authority without popular approval, do you? Haha. Then you don’t know us yet.”

“No, I agree, elections are the way to go. But...”

“Don’t worry Robin, we’ll compensate you well for this forced employment.” Bose da winked. “free 24/7 virtual access to life on earth.”

Well, real managers don’t crib. They negotiate to get the maximum. And that’s what I did.

“I need a bonus, Bose da. My wife’s dual spirit status is to be unlocked so she can come visit me anytime she wants.”

“Done, Robin. You indeed are a fevicol-couple.”

Well, readers, I can’t complain much now, can I? wife, tentualtala, pujo committee – all there. Win-win situation.

As I clapped my hands in joy, with a jolt, my eyes opened. A dream after all! But wouldn’t it have been nice if we could commute between the two worlds?

* Strictly Fiction

What If?

Ditoya Ghose

What if there was no money?
Would the world be a better place?
No war, no hatred, no jealousy,
Would that be the case?

What if there was no religion?
Would we all be able to get along?
No war, no hatred, no jealousy,
No accusations of wrong?

What if there was no poverty?
Would we all just be equal?
No war, no hatred, no jealousy,
No need to be deceitful?

What if there was no selfishness?
No thievery or greed?
No war, no hatred, no jealousy,
No innocents forced to bleed?

What if there was world peace?
Could we all live in harmony?
No war, no hatred, no jealousy,
Would we all just smile and *agree*?

Ruakaka Stars

Sananda Chatterjee

Under the roundest, brightest moons
'neath a bejeweled
Perfectly clear southern sky
When the only sound that came to ear
Was the magnificent symphony
Of waves crashing
I thought of you...
Over oceans...admiring the same moon perhaps
Hoping that you thought of me
With affection
If fate is kind
And our paths entwine
In a place where time hesitates
And watches
A night quite perfect as this
I would claim a spot on your shoulder
And tell you about the time
I sat quietly under a clear sky
And heard the waves
And amidst all the stillness and beauty
My mind wandered only to you...

তারপর

মণিশংকর বিশ্বাস

কচুরীপানার 'পর শান্ত সন্ধ্যা এসে বসে
বাছুরের চোখের মতন স্বচ্ছ কালো, ভাষাহীন
যা কিছু কল্পনা করা অসম্ভব
তার মত চাঁদ, একটি অবশ পাখি
এক সঙ্গে বিধে আছে নাঙা খেঁজুর কাঁটায়
দূরে মেঘের মতন চাষী মিশে যাচ্ছে পাতার আড়ালে
আমি কে বা কেন- এই প্রশ্ন আবাস্তর তারপর...
একদিন চিন্তার শুদ্ধতা দিয়ে, পায়ে পায়ে
পৌঁছে যাবো নবদ্বীপ, বিষ্ণুপুর, দূর ফরাস ডাঙায়
তাল বনের ভিতর দিয়ে কেউ একজন হাওয়ার মতন
সেই চাঁদের হিরণ ওলোট পালট ক'রে দিয়ে চ'লে যাবে
এক পাশে গোলাঘর, বাঁশবন, ছোট একখানি জল
যেন জোনাকপাড়া, প্রসন্ন শিউলি গাছ, আমার কবিতা...
তারপর?

#

সম্ভবত আর কিছু নেই রক্তের ভিতর।

Strokes of my Pen

Sananda Chatterjee

As imagination meets reality
On this piece of paper –
Memories, hopes and dreams
And everything I own, in between
Between your truth and my truth
That truth lives, here.
Everything I can muster...is safe
It moves from my pen to this once blank piece of paper
Now rather full of... stuff
You are safe within my stuff filled piece of paper
And you may stay, perfectly captured in time
For as long as it stays safe and keeps you within its edges
Where my memories and hopes and dreams
Take shape in these strokes of my pen
And becomes forever...
You will find me within this piece of paper.
You will find me – here.



LOTUS FOREIGN EXCHANGE

CONVENIENT ~ AFFORDABLE ~ SPEEDY
No Commission or Fees on Currency Exchange

Foreign Exchange

**Exchange your Foreign Currency and
Travellers Cheques at best exchange rates**

Telegraphic Transfers

Send Money to India

- Fee only \$10
- No deduction at banks in India
- Draft delivery in India is also available at no extra charge

Send Money to Fiji

- Fee only \$8

Send Money to Rest of World

- Send money to any Bank Account across the globe Fee only \$15

MoneyGram

- Instant Money across the Globe
- Excellent Conversion Rate
- No Bank Account needed
- Reasonable Fees
- Real Value for your Money



Visit: www.lotusfx.com ~ Phone: 0800 44 22 88



LOTUS GOLD MERCHANTS LIMITED

Shop 74A, Westfield Shopping Mall, Manukau, Auckland
Phone: 09 263 4878, Fax: 09 262 2937, Email: info@lotusgold.co.nz
AND

Shop 108, Westfield Shopping Mall, Queensgate, Lower Hutt
Phone: 04 589 9584, Fax: 04 589 9583, Email: lotusgold_LHB@hotmail.co.nz
AND

Shop 27, LynnMall Shopping Centre, New Lynn, Auckland
Phone: 09 825 0122, Fax : 09 825 0129, Email: lotus_lmb@hotmail.com



**Stunning range of 18 karat
white & yellow Gold Diamond Jewellery**



Wide range of 22 karat Indian Gold Jewellery plus:
Precious Stone Jewellery
Silver Jewellery
Gold & Silver Bullions
We buy old Gold ~ Free in-store assessment

Discover Lotus Gold today

Convenient parking

Finance Available

Open 7 Days
Late Nights: Thursday—Friday
Shop Online at: www.lotusgold.co.nz



Probasee Bengalee Association **ACTIVITIES**





PROBASEE SPORTS & PICNIC

Shovik Nandi (Sports Secretary)

2014 capped off a very exciting, captivating and enjoyable year in sports for Probasee. We kicked off the year with Dr. Bhaskar Chatterji Memorial Indoor Soccer Tournament and were very fortunate to have the event sponsored by Dr. Madhumati Chatterji and her two sons - Jeet (Jojo) and Joy. It was great to see both Joy and Jojo back for the tournament!

Probasee once again participated in the annual Relianz Forex Spirit of Cricket Tournament. Although the Probasee team always performs exceedingly well at this tournament, unfortunately, this year, we had an upset leading up to the semi-final stages and finished 5th. It was indeed a very disappointing end to an extremely competitive tournament consisting of 11 very able teams. The cricket season spanned for 3 months, with games played every Sunday. We vow to come back better and stronger next year around.

At the end of the cricket season, we had a day of *Badminton & Table Tennis* and it was very heartening to see a good turnaround in all three of these events and the healthy participation ensured – let us say that the spirit of competition is alive and well amongst our fellow Bangalis! And we also had our ever popular annual picnic, which as always, was an amazing success! We have had a very sport filled year and hope to have even more activities planned for the future.

All the photos are found on the *Probasee Facebook* page. If there are any suggestions in the sporting sector for the future - please do let us know. We look forward to seeing you all there in the upcoming tournaments and events.





CULTURAL RECAP

2013–2014



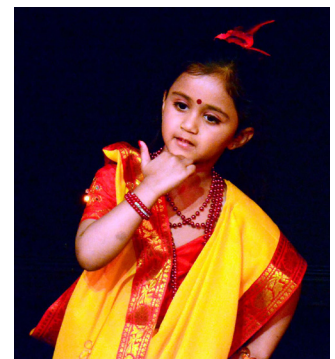
We have had a very active and productive year, and has been a very fulfilling start for us, the newbies in our roles as the cultural committee in 2013-2014. Here are some of our highlights!

This year we brainstormed various ideas about building our community and engaging our members, and so Probasee had its first Movie Night which was a tribute to Rituparno Ghosh. It was a fun evening where there was catch up and mingling, a great movie and amazing snacks and food. It was a success. This inspired us to have a second movie night, which turned out to be another success.

2013 saw Probasee's annual Durga puja at a new hall and location. The turnout was great and the Pujo ran successfully. It was inspiring to see Probasee's young generation performing in the cultural programs, taking part in competitions like the Art competition, fancy dress and talent quest. Following the annual Durga puja, in early February of 2014 we had our annual Saraswati Puja. We also had a great Poila Boishak celebration, where members participated, made delicious food and sang some wonderful classics. All in all it was a great 'adda'. Our latest cultural event was Rabindra Jayanti which was one of our bigger cultural events. We had a number of participants in both performance and back stage. We got to see some brilliant performances from kids and adults and we got to hear some breath taking performances.

All photos from the past events can be found on the Probasee Facebook page. The Probasee Facebook page is regularly updated and all the details for the future events will also be available there. We look forward to another eventful and fun filled year ahead of us. Keep supporting the cultural team and help build our Probasee community. We would also like to thank each and every one of you who has supported and participated in these past cultural events and welcome your participation in the future events.

Sayantani & Sananda
Your Friendly Neighbourhood
Cultural Team
2013-2014
Photo Credits:
Shovik Nandi & Sujoy Biswas



INDIA GATE

FINE INDIAN DINING

0800 INDIA GATE

**\$9.90
ALL MAIN
CURRIES**
(Dine in or Takeaway)
Monday - Thursday
(*Except prawn curries)

**BUFFET
LUNCH
VEG. & NON-VEG.**
(12-14 items -
Min. 4 Main curries)
\$14.90 *Per Person
11:30am - 2:30pm
Saturdays & Sundays



Call us today!

09 6310047

380 Manukau Road, Epsom

www.indiagateresaurant.co.nz

Indian Restaurant & Takeaway

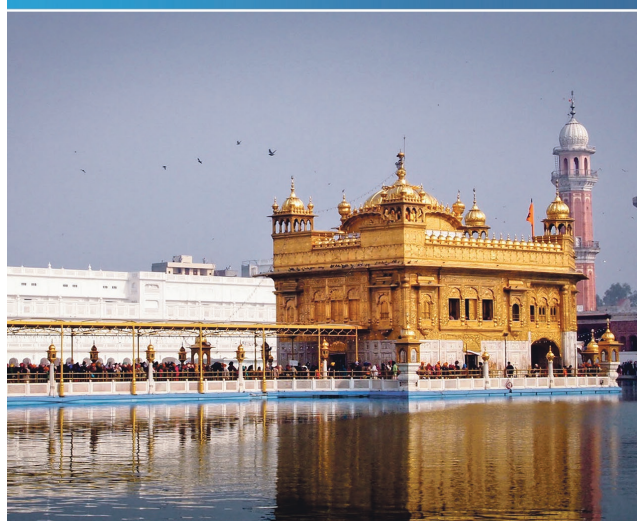
Free delivery *Conditions apply

Delight your taste buds with delicious Indian cuisine!



INDIAN SUB CONTINENT SALE!!

*Get the best deals in town, for flying to
India*



Call us:

Shell 021 297 3259 **Zulfi** 021 915 329 **Tony** 021 022 88835



Unit 0, 8 Bishop Lenihan Place, East Tamaki
P 09 272 3522/272 3544 F 09 272 3577 E travel_shop@xtra.co.nz

www.travelshopnz.co.nz



Please note availability is Limited. Tickets must be issued within 3 days of booking to avoid auto-cancellation.

*Airfares Include Fuel and Insurance Surcharges but not Govt Taxes (*taxes may vary for different cities and as per FX variations)

‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এবং ‘পুত্রং দেহি’

দিলীপ কুমার দাস

কিছুদিন আগের কথা। ব্রহ্মা নারদের সঙ্গে মর্ত্যলোক ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিনি মাঝে মাঝেই এরকম ভ্রমণ করেন। বাহন হল নারদের টেকি যন্ত্রটি। বেশ কয়েক বছর পূর্বেও এই যন্ত্রটির আদল মর্ত্যলোকের ‘ধান-ভানা টেকি’র মতই ছিল। অধুনা বিশ্বকর্মা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে এটিকে দুই আসন বিশিষ্ট ছোট একটি বিমানের আকার দিয়েছেন। সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত এবং শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত এই টেকি-বিমান এখন অনেক বেশী নিরাপদ এবং আরামপ্রদ। আকাশ-মহাকাশমার্গের ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কোন কিছুই এখন এর ক্ষতি করতে পারে না। মর্ত্যলোকের আধুনিক বিমানপোতের স্কাইবেডের মত এর যাত্রী আসনটিকে পিছনদিকে হেলিয়ে একটি শয়্যায় পরিণত করা যায়। বলাই বাহুল্য, চালকের আসনে আছেন নারদ এবং যাত্রী হলেন পিতামহ ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা আর নারদ হলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রিপোর্টার। টেকি বাহনে চড়ে, বীণা বাজাতে বাজাতে এবং মুখে সর্বদা ‘নারায়ণ, নারায়ণ’ নামটি নিয়ে নারদ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ঘুরে বেড়ান এবং সংবাদ সংগ্রহ করেন। এই সংবাদগুলি তিনি প্রধানত তাঁর প্রভু পালনকর্তা শ্রীবিষ্ণুর কাছে রিপোর্ট করেন। তবে সময়ে সময়ে ব্রহ্মার পাইলটগিরিও তাঁকে করতে হয়। ব্রহ্মাকে মাঝে মাঝেই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণে যেতে হয়। এর কারণ তাঁর সৃষ্টিতে কোথায় কি ঘটছে তা প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করা। সবসময় ধ্যানযোগে বা অন্যের বর্ণনায় সঠিক অবস্থাটা উপলব্ধি করা যায় না।

জনান্তিকে ব্রহ্মা শুনেছেন মর্ত্যলোক এখন ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে। এই ভারসাম্যহীনতা বহুবিধ, যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা, শক্তির ভারসাম্যহীনতা, প্রজা ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রজা ভারসাম্যহীনতা নিয়েই তিনি বেশী চিন্তিত। কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে এটিই তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। এই ভারসাম্যহীনতার অনেক কারণ থাকলেও মানুষের ক্রিয়াকলাপই নাকি অনেকাংশে দায়ী। নারদ বললেন, “পিতামহ, চলুন মর্ত্যলোকবাসীরা যাকে সূর্যোদয়ের দেশ বলে সেই জাপান দিয়ে আমরা ভ্রমণ শুরু করি। তারপর চীন এবং ভারতভূমি পরিদর্শন করবেন। ইচ্ছা করলে এবং নিরাপদ বুঝলে সবশেষে না হয় মধ্যপ্রাচ্যেও একটা চক্কর দিয়ে নেবেন।”

কিছুদিন আগে জাপানের ফুকুসিমা নগরে প্রবল ভূমিকম্প এবং তজ্জনিত সুনামিতে যে লোকক্ষয় এবং জনপদলয় হয়েছে ব্রহ্মা তা প্রত্যক্ষ করলেন। তবে এই নিয়ে তিনি বিশেষ চিন্তিত নন। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে লোকক্ষয় ইত্যাদি ঘটলেও, প্রাকৃতিক নিয়মেই তা আবার পূর্ণ হবে। এগুলো দীর্ঘস্থায়ী ভারসাম্যহীনতার কোন কারণ নয়। তাঁর চিন্তা অন্য জায়গায়। সুতরাং জাপানে বেশী সময় অতিবাহিত না করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁরা চৈনিক ভূখণ্ডের আকাশসীমায় প্রবেশ করলেন। ভূখণ্ডের উপরে আকাশমার্গে বেশ কিছুটা অগ্রসর হতেই একটি কটু ঝাঁঝালো গন্ধ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল। তিনি বললেন, “নারদ, আকাশের গায়ে কেন টক টক গন্ধ?” নীচের ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকিয়ে তিনি পরিস্কারভাবে কিছু দেখতে পেলেন না, সবই কেমন ঝাপসা, আবছা আবছা। নারদ বললেন, “পিতামহ, এ সবই মানুষের ক্রিয়াকর্মের ফল। প্রগতির নামে, ভোগসর্বস্ব জীবনযাপনের জন্য মানুষ প্রকৃতিকে তছনছ করে মর্ত্যলোকে শৈল-দলন-লৌহ-গলন যন্ত্রসভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেছে। ধরিত্রীর গর্ভ থেকে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত কঠিন জীবাশ্ম এবং তরল ইন্ধন উত্তোলন করে তাদের দহনজনিত শক্তিতে এই যন্ত্রসভ্যতার চক্রকে সচল রেখেছে। এই যে কটু গন্ধ তা ঐ দহনসৃষ্ট অম্লভাবাপন্ন বায়ুর জন্য। আর এই সঙ্গে যন্ত্র এবং যানবাহন নিঃসৃত ধোঁয়া-ধুলো, ঝুল-কালি ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই অনেক সময় স্পষ্টভাবে ভূপৃষ্ঠ দৃশ্যমান হয় না। এইভাবে মর্ত্যলোকে দুই জনবহুল ভূখণ্ড চীন এবং ভারতবর্ষে প্রজাভারে এবং প্রকৃতির উপর যন্ত্রদানবের অত্যাচারে আকাশ-বাতাস আজ ধুলিমলিন, বিষবাষ্পাকুল। এছাড়াও আরো আছে। তার জন্য অবশ্য তথাকথিত উন্নত ভূখণ্ডগুলির প্রজাবর্গের বেহিসাবি জীবনযাপন এবং ভোগবিলাসই মুখ্যত দায়ী। তাদের যন্ত্র এবং যানবাহন থেকে চীন এবং ভারতবর্ষে নির্গত অম্লজান অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ অম্লজান নির্গত হয়ে নভোমণ্ডলের উচ্চস্তরে আরোহণ করে ধরিত্রীকে আবৃত করে রেখেছে। আর তাতে করে সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ পৃথিবী থেকে নিষ্কাশিত হতে পারছে না – পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

আক্ষরিক অর্থেই ধরিত্রী জুরাক্রান্ত। এই উষ্ণায়নের ব্যাপ্তি সমগ্র পৃথিবী জুড়েই। মর্ত্যলোকের পণ্ডিতেরা গবেষণা করে এবং অঙ্ক কষে অনুমান করছেন যে এইভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীর বর্তমান ভারসাম্যের সামগ্রিক বিনাশ আসন্ন।

এই ভারসাম্যহীনতা এবং তার ফলাফল মর্ত্যলোকের মুরব্বির সামলাতে পারবে কিনা কেউ জানে না। যখন এই নিয়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের এবং কর্তাদের মধ্যে শলা-পরামর্শ হয়, তখন তারা একে অপরকে দোষারোপ করে, কাজের কাজ খুব অল্পই হয়। প্রভু বিষ্ণুকেও এই সমস্যার কথা বলেছিলাম। তাঁর কথাবার্তা শুনেও মনে হল না যে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তিনি খুব একটা আশাবাদী বা জোরালো কোন পথনির্দেশ দিতে পারেন। সব শুনে ব্রহ্মা উদাসীন হয়ে বললেন, “তাহলে আমার সাধের সৃষ্টি মর্ত্যলোকের এখন এইরকম দুরবস্থা! হয়তো এগুলি সবই মহাপ্রলয়ের সংকেত। ব্রহ্মলোকে ফিরেই এই নিয়ে বিষ্ণু আর মহেশ্বরের সঙ্গে জরুরী আলোচনায় বসতে হবে। যাইহোক, এখন আমাকে মর্ত্যলোকের প্রজা ভারসাম্যহীনতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা কর।”

নারদ বললেন, “মর্ত্যলোকে মানব-বিবর্তনের আদিকাল থেকে গত তিন-চারশো বছর আগে পর্যন্ত বেশ একটা স্থিতিাবস্থা বজায় ছিল। তারপর মানুষ মৃত্যুদূতরূপী বিভিন্ন রোগব্যাদিকে প্রতিহত করার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে শিখল। সেই নবলব্ধ বিদ্যার্জনের প্রথম দিকে মৃত্যুকে কিছুদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখলেও জন্মের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। আগে জন্ম-মৃত্যুহারের মধ্যে যে একটা ভারসাম্য ছিল তা নষ্ট হয়ে প্রভূত প্রজাবৃদ্ধি হল। সেই প্রজাবৃদ্ধিকে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করেছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাদের বোধোদয় হল যে ধরণীর ধারণশক্তি সীমিত। লাগামছাড়া বৃদ্ধিতে এই সীমিত ভূখণ্ডে সকলের স্থান-সঙ্কুলান হবে না। দেখতে দেখতে ধরণী প্রজাভারে ভারাক্রান্তা হলেন। আর সেই ব্যাপারটি প্রবলভাবে ঘটল চীনদেশে এবং ভারতবর্ষে। এই দুই দেশের কর্তারা যখন ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন তখন জারি হল জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান। চীনদেশ খুবই কঠোর অবস্থান নিল। আইন হল ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ অর্থাৎ কোন দম্পতির শুধু মাত্র একটিই সন্তান থাকবে, দ্বিতীয় নাস্তি। ভারতবর্ষ প্রথম দিকে অতটা কঠোর অবস্থান নেয়নি। জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর শুরুতে তার মন্ত্র ছিল ‘দো ইয়া তিন’। পরে পরিবর্তন করে সেটা হল ‘হাম দো, হামারা দো’। চীন কিছুদিনের মধ্যেই ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ অর্থাৎ ‘এক পরিবার এক সন্তান’ নীতির দুর্বলতাটিও বুঝতে পারল। সেটি হল এই সন্তানটি বড় হয়ে কর্মক্ষম হলে তার উপর নিজের পরিবারেই অনেকগুলি বৃদ্ধবৃদ্ধার ভরণপোষণের ভার বর্তাবে। দেশের জনসমষ্টির বৃদ্ধায়ন হবে। এই বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ভরণপোষণ সমেত অন্যান্য অর্থকরী কাজ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সক্ষম লোক পাওয়া যাবে না। এই উপলব্ধি থেকে চীন তাদের এক পরিবারের এক সন্তান নীতি অনেকটাই শিথিল করেছে।”

চীনদেশে প্রজাভারসাম্যহীনতার এই বর্ণনা শুনে ব্রহ্মা বেশ মুষড়ে পড়লেন। নারদকে বললেন, “চল, এবার ভারতভূমির দিকে যাত্রা কর।” হিমালয় পর্বতকে পাশ কাটিয়ে উত্তর-পূর্ব কোন দিয়ে তাঁরা ভারতবর্ষের আকাশসীমার মধ্যে প্রবেশ করলেন। আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে তাঁরা এলেন ভারতভূমিরই একটি অঙ্গরাজ্য বঙ্গভূমির উপর। এখানেও আকাশ ধুলিধূসরিত। নীচের কোন কিছুই পরিস্কারভাবে দেখা যায় না। এখানেও বায়ুদূষণের একই সমস্যা। বঙ্গ তথা ভারতভূমির গগণমার্গে ভ্রমণরত অবস্থায় বার বার ‘দেহি’ ‘দেহি’ শব্দসম্বিত মন্ত্রোচ্চারণ ব্রহ্মার শ্রবণে এল। তিনি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, “দেহি দেহি করে ভারতভূমির মানুষ কার কাছে কি চাইছে?” নারদ বললেন, “বঙ্গদেশের লোক দেবী দুর্গার খুব ভক্ত। তারা দেবীর আরাধনা করে তাঁর কাছে ধন, মান, রূপ, যশ এসব প্রার্থনা করছে। আর তার সাথে আরও একটি প্রার্থনা তারা করছে। তা হল পুত্র। সবাই বলছে ‘পুত্রং দেহি’। কেউ কিন্তু ভুলেও ‘কন্যাং দেহি’ বা ‘পুত্রীং দেহি’ বলছে না। চীন দেশে যেমন ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ সন্তান-নীতি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে তেমনি ভারতবর্ষের এখন হল ‘পুত্রং দেহি’র সমস্যা। এই ব্যাপারটা আমি আপনাকে একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করছি।

ভারতভূমির ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে বংশরক্ষা এবং মোক্ষলাভ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তারা প্রাচীনকাল থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং মুনি-ঋষিদের প্রবচন থেকে এটা ধরে নিয়েছে যে বংশের ধারা পুত্ররাই রক্ষা করতে পারে, তাদের পিণ্ডপ্রদান পরলোকগত পূর্বপুরুষদের মুক্তি বা মোক্ষলাভের জন্য অবশ্য করণীয়। কন্যারা নাকি এসব কর্মে অনধিকারী, অক্ষম। সুতরাং সন্তান হিসাবে এদেশের মানুষ যে পুত্রাকাঙ্ক্ষী হবে তা আর বিচিত্র কি। এখন এর সঙ্গে আরো একটা

ব্যাপার যুক্ত হয়েছে। এদেশের মানুষ এমন একটা সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যেখানে কন্যার বিবাহে পিতামাতাকে প্রচুর, অনেক সময় সাধ্যাতিত, ধনদৌলত যৌতুক দিতে হয়। ধর্মীয় এবং সামাজিক এই দুই আবহের প্রভাবে অনেক পিতামাতা এবং পরিবারের কাছে কন্যাসন্তান অনাকাঙ্ক্ষিত, বোঝাস্বরূপ। এদিকে আবার বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতির ফলে এমন কৌশল, এমন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে যাতে সহজেই গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গনির্ণয় করা যায়। এইভাবে গর্ভসঞ্চারণের কিছুদিনের মধ্যেই তার লিঙ্গনির্ণয় করে বেছে বেছে কন্যাক্রমণগুলিকে নষ্ট করা এখন একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও দেশের কর্তারা আইনপ্রণয়ন করে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গনির্ণয় নিষিদ্ধ করেছে তবু এই কর্মটি বিভিন্ন অঞ্চলে গোপনে প্রচলিত রয়েছে। আর তার ফলশ্রুতি হল কন্যা এবং পুত্র সন্তানের অনুপাতে প্রবল বৈষম্য। দেশের কোন কোন অংশে এই অনুপাতটি ৯০০/১০০০ এরও কম। সহজ কথায় এর অর্থ হল এই প্রজন্মেই প্রত্যেক পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী জুটবে না। এমনিতেই দেশে তামসিকতার প্রভাবে নারীনির্যাতন, নারীপাচার, ধর্ষণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর লিঙ্গবৈষম্য এই অপকর্মগুলিতে আরো ইন্ধন জোগাবে বলেই মনে হয়। এইভাবে মর্ত্যলোকে লাগামছাড়া প্রজাবৃদ্ধি, এক পরিবারে একটি সন্তান নীতির সমস্যা এবং জনসংখ্যায় লিঙ্গানুপাতের বৈষম্য প্রজাভারসাম্যকে দুর্বল করে দিয়েছে, তার ভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

নারদের ব্যাখ্যা থেকে মর্ত্যলোকের প্রজাভারসাম্যহীনতার চিত্রটি ব্রহ্মার কাছে অনেকটা পরিস্কার হল। তাৎক্ষণিক চিন্তা করে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে তার নির্দিষ্ট কোন দিশা তিনি দেখতে পেলেন না। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আরো প্রজাসৃষ্টি করে যদি সমস্যার সমাধান করা যেত তাহলে ব্যাপারটা তাঁর কাছে সহজ ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রজাবৃদ্ধিই একটি সমস্যা। তার উপর এক সন্তানের সমস্যা, লিঙ্গবৈষম্য এসবও আছে। তিনি ভাবলেন ভ্রমণটা সমাপ্ত করেই এই নিয়ে বিষুৎ এবং মহেশ্বরের সঙ্গে জরুরী আলোচনায় বসতে হবে।

তিনি নারদকে বললেন, “চীনভারতের বিভিন্ন ভারসাম্যহীনতার কিছু কিছু নিদর্শন তো প্রত্যক্ষ করলাম। এখন আমাকে বল মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাটা কি? ওখানে কিসের সমস্যা? ওখানে যাবার প্রয়োজন আছে কিনা বা যাওয়া নিরাপদ কিনা?”

নারদ বললেন, “মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা হল শক্তির ভারসাম্যহীনতার। মর্ত্যলোকের মানুষেরা প্রচণ্ড গোষ্ঠীতান্ত্রিক। বিভিন্ন গোষ্ঠী মর্ত্যলোককে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে এক একটি খণ্ডের কর্তৃত্ব নিয়ে বসে আছে। নানাবিধ কারণে অনেক খণ্ডের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই আছে। কয়েকবছর আগেও এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দুটি ছিল সর্দারগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধবিগ্রহ না হলেও একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধের বাতাবরণ সবসময়ই বর্তমান ছিল। ইদানিং তাদের একজন কিছুটা হীনবল হওয়ায় অন্য সর্দার গোষ্ঠীটি গোটা মর্ত্যলোকেই আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। বাকি সব গোষ্ঠীগুলির কেউ তার সঙ্গে সহমত না হলে অথবা কোন ব্যাপারে তার বিরোধিতা করলে তাকে সর্দারের কোপে পড়তে হচ্ছে। এই নিয়ে জায়গায় জায়গায় যুদ্ধবিগ্রহ, লড়াই বেধে যাচ্ছে। এখন মধ্যপ্রাচ্য হল এরকম একটি লড়াইয়ের ক্ষেত্র। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য মর্ত্যলোকের যন্ত্রসভ্যতা সচল রাখার শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার। এই শক্তির জন্য অনেকেই লোলুপ। এই অঞ্চলের ইরাক, ইস্রায়েল, প্যালেস্টাইন অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে। এর মধ্যে একটা শঙ্কার ব্যাপার হল মানুষ এখন ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে নভোচারী বিমানকে ভূপতিত করার প্রযুক্তি আয়ত্ত করেছে। সেই জন্য বিমান নিয়ে আমাদের ওদিকে যাওয়া নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। বলা যায় না কখন আবার কে আমাদের বিমানকে আঘাত করে না বসে!

নারদের মধ্যপ্রাচ্য-বর্ণনা শুনে ব্রহ্মা বললেন, “তাহলে ওদিকে না যাওয়াই ভাল। তবে তুমি অন্য একটা কাজ কর। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা পুস্করটা একবার ঘুরে যাওয়া। মর্ত্যলোকের ঐ একটি মাত্র জায়গাতেই আমার মন্দির আছে কিনা। তোমাকে সেখানে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করতে হবে না। শুধু মন্দিরের উপর তিনটে চক্র দিয়েই ব্রহ্মলোকে ফেরার পথ ধরবে।

নারদ বললেন, “যথা আজ্ঞা, পিতামহ।”

১৪ আগষ্ট, ২০১৪।

ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড।

The Immigrant

Shopan Dasgupta.



The grass is always green on the other side – as the saying goes.

It is the dream of every immigrant to live a worry free life in a new country that can offer much. A place where one can raise their children free of problem plaguing their previous country and a place where one can grow socially, economically and possibly spiritually as well.

Yet with these incentives, one can be put through an internal struggle between ones past and one's present. This struggle is over the decision off assimilating into the "new societies belief"s, traditions, cultures and heritage, or clinging on to the past cultures and lifestyle. Contradictions despite being in a land away from 'HOME'.

Immigration is said to bring diversity and richness to New Zealand, yet 'this richness generates issues or dilemmas for minority groups, individual group members and the New Zealand society in general.

Assimilation can be drastic or very simple, from changing ones diet, form of clothing and attire and making other changes including possibly converting ones religious beliefs. In some cases it is beyond ones control, yet this adaptation can occur without even ones realization. Some things have to do be done simply for the heck of it.

The determining factor of whether to assimilate or not depend on the morals and beliefs that the immigrant has been brought up on. If the immigrant was brought up on strong morals and beliefs towards their religion and nationality, chances are that the immigrant would rather be alienated and looked down upon rather than conforming to the beliefs and morals of the people in the new country.

That is what has influenced our decision to make it to this country of milk and honey as the Kiwis would say.

Just post-independence when people from India would venture out of their country, more often than not the case would be to pursue higher studies to gain qualifications to make it a matter of pride and prestige. It was considered that a privileged few could make this OE.

Just to cite an example my parents went to England in the sixties and all they had with them as opening balance was about 5 pounds. My father went on a scholarship to pursue his studies and to do his doctorate. Knowledge was his key pursuit.

Air Travel was then a very expensive exercise. It was a luxury. Indian society was broadly two categories – the rich, and the poor. There was a small threshold of people who were deemed to be ‘middle class’.

As India progressed and Indian society modernized its outlook and the socio economic condition of the middle class family improved – people started to think about venturing abroad. The same middle class is where the transition has taken place and now it is a three tier system – the upper, middle and lower middle class. Sounds like the berth available on Indian railways.

Air Travel around the globe also modernized and one had more options. The increasing amount of discretionary spending in India has increased over the last couple of decades. Affordability has widened and hence the stories of ‘influx’ have increased exponentially.

New Zealand historically has been a country of migrants. Its history dates back to the influx of migrants and the population base has been migratory. New Zealand’s doors to real immigration from India opened in the early to mid 90s and the real influx of people started around that time. Immigration wasn’t so popular in the 80’s.

Immigration is a means to a new beginning. We all come here to improve our lives. Supposedly that is why we are here. We have this fixation in our minds that we need to earn in dollars or pounds. We need to have a better work life balance. We need to have peace of mind and we need to get away from ‘what has been’ and create a new ‘what will be’.

I can assure you that – life of an immigrant isn’t easy at all. It is always better ‘the devil you know than the devil you don’t. The initial years are full of struggles.

New Zealand immigration policy – we need skilled migrants who can help the economy of the country as well as populate it, increase the demographics. It is all economics here on and is linked with the growth in Gross Domestic Product. New Zealand is good in bringing in migrants, but not good at ‘settling them’.

Citing an average example – a couple land here with Permanent residency and as soon as they touch down at Auckland International airport – their struggles begin. The struggles to settle in a foreign land, the struggles to make all that investment back in India worthwhile.

Struggles are always associated with hardships and so the hardship begins.

On touching down at the airport ones first encounter is with the MAF officers at the airport. They suspect that those coming from India would have spices, plant products and other hazardous items which shouldn't be allowed into this pristine country. Then as soon as one is out of the airport, the cold strikes you as though saying "welcome to New Zealand... better get used to me".

From the very next day there are three things in mind – a job, an accommodation and a car. Having a car and being able to drive is almost a pre-requisite.

Reading the newspapers, or talking to friends to scope out the possibility of getting a job, applications are made and in due course of time 'thank you letters' start filling your letter box.

Many of these letters cite reasons such as – unfortunately on this occasion you have been unsuccessful. We wish you all the best in your future endeavours. We find that you are overqualified for the position that you have applied. We are sorry to inform you that though you have all the pre-requisites, you have been unsuccessful on this occasion. We will be keeping your resume on our data base.

The few interview calls that one gets – the common question being asked is – do you have any New Zealand experience. I need not delve on this one. I am sure most people have encountered this situation.

So where do we normally end up – in the retail chains, in hotels as receptionists or chefs, with the security companies, in the hospitals as orderlies or cleaners or in admin, in the telecommunications company as CSR's and possibly in petrol stations as attendants or with cleaning companies. The immigrant needs to be reminded that – no job is big or small. Every kind of work is respectful and take pride in what you do.

Invariably one does take the first job that comes ones way as they have to get the bank building some balance in order to pay for the bills as well as survive on a day to day basis.

So the odd job has been taken, either husband only, or wife only or both husband and wife doing some job which they had never thought they would be doing.

Immigrants who come with entire family – that is with children as well it may not be a lot different except for the fact that taking care of the children going to school become another step in the process. That is relatively easier than in India.

Well accommodation taken care off, job not to my liking but will do until I find one in the field in which I specialize, bank account having been opened, daily rations coming in, life is on track but on a very steep gradient. Many days of austerity measures have to be put in place.

Days of 'sanction' towards self. It is indeed a very hard battle initially to get the debit side of ones ledger looking better than the credit side of things. It takes a while to develop the art of 'savings' in this country. Diet is another thing that one has to adjust, especially the vegetarian immigrant.

At this stage an average immigrant is hardly having any hours off work. Excessive hours of work have to be put in. The effect is low or nil mileage on social life. Yes but one aspect that I have noticed is that given India is a huge country and we have immigrants from different states coming here, most people try and associate with mates from their own state. The immigrant has to get used to a few new words – such as 'kiaora, dude, and bro.

A car – doesn't matter if it is late model, it has to be affordable and economical, a car that can get me from A to B and back as and when I work. A car that can take me to the flea market on the weekends coupled with a few parks and beaches. A car that can help me take baby steps towards socializing.

Just as the saying goes – everything takes time – so it does to settle in a foreign land which is about 11000 miles away from ones real home. It is not a rule of thumb but it normally does take about three years to find ones foot on this foreign land and may be a further two or three years before one can firmly say that they have settled down and made this country their own

The fact being that New Zealand is a country that has been built by immigrants, there still exists this distinction between the privileged few and the not so privileged. We only open to this fact on arrival and trying to get a foothold in terms of our position in the work force and in society.

A simple example is – when I came to this country having applied for permanent residency I had to do the IELTS test.(International English Language Testing system) The idea behind that was that if we wished to do further studies or we wanted to get a better job the higher the band in terms of a result the better one stood a chance of succeeding.

In November 2002 New Zealand government raised the level of competence in the English language from band 5.0 to band 6.5 on the proficiency test for applicants seeking resident visas and work permits. This was the first of the several policy adjustments that were introduced to obtain better settlement outcomes for immigrants.

What surprises me even today is the fact that there are other immigrants here for whom English would be their fourth or fifth language, but they are given preferential treatment in all facets of life. It would be fair to be blatantly truthful about the fact that migrants from a few select nations are given better treatment than those arriving from India.

China - far ahead in terms of visitor and student arrivals and in approvals for family sponsored under family category. The immigrant walks down Queens street for the first time and it feels like being in a modern city like Singapore, Hong Kong or Beijing. Walk near Auckland University and you would feel that you are at the University of Beijing. Preferential treatment.

Figures show that last year 38% of immigrants were former international students and India overtaking Britain in terms of skilled immigrants. Asians have moved from being a 'significant number' to 'dominating' most immigration categories.

Life of an immigrant though hard at times does reward perseverance, persistence and patience. Life sways between prejudices and practises. Time is the most essential factor here. In the earlier days of immigration from India when the Indian diaspora was very small it must have been a harder task to try and accept the fact that we have made the conscious decision to make this our country of residence for future generations to come.

Today things have eased a lot in the sense that the Indian diaspora is huge and there is help from most quarters. All one has to do is 'shout out' for the same. Even though the initial years are a bit of a struggle things do tend to settle down a lot faster. There are off course a few cases where – there is a return to the pavilion.

The one big question that one must ask – “do I really want to make this my country? Do I really want to stay here for the rest of my life? Am I a misfit in this society? What is my identity? Is this what I had thought New Zealand will have in store for me.....??”

*Best
Compliments and
Greeting for Dashera
from*



**RAJESH THAKKAR
DIRECTOR**

YOGIJI'S NZ LIMITED

**22/26, Carr Road, P.O. Box 27163, Mt Roskill, Auckland, NZ
Tel: (09) 624 5757 Fax: (09) 624 5758 Mob: 021 030 9138
E-mail : yogijisfoodmart@yahoo.com**

Broken

Sananda Chatterjee

Under such circumstance – what is my plight?
Nothing
Where do I stand in the great scale of things?
In between – luxury and slight
Discomfort from the cold weather
I'm ok – there is nothing wrong with my life.
Provided for, well kept, educated
Family, friends, job
Where is my distress? I am ok.
Not war torn, not impoverished. Not dead in a fatal accident or by the fury of Mother Nature.
A few flawed personality traits,
A few tarnished relationships
A few failed connections.
So what? My walls are intact.
There are cracks, sometimes these are fences close to home
But that's just perspective – I have not suffered.
What suffering? Perspective.
I am grateful to my stars. You don't bother me.
Your opinions, they bother me even less.
You're presence in my universe, is only but a speck of dust –
That momentarily irritates my eyes. And I wash it with cold water,
And it's clean. Tears, angst...brief interruptions in my otherwise fine life, between luxury and slight discomfort
from the cold weather
I thank my stars. And my heart goes to you. Your suffering is greater than mine.
I haven't been in your position. If I was, I might have been
Broken.



I had a dream and I wrote it down

Sananda Chatterjee

I had a dream and I wrote it down
So I wouldn't forget it
So vivid and sharp, it would have cut my tongue
And these words kept it safe...
Otherwise I would forget it

But I didn't...
I walked around with it in my head
For so long that I forgot... the truth – or so they
said
How could I forget the truth...?
They tell me you are
A figment of my mind
A trick of my brain

But that is most silly!
How can you not be true?
All those coffees and conversations
Loving and laughing, the wine and the wisdom
The endless hours spent not doing anything
In full view of everyone...

And they try to tell me
That you won't come visit
Because I made you up... you're a lie
But I know better... I think I know
But oft late I can't tell

I had a dream and I wrote it down
So that it would leave my head and
It wouldn't follow me around
I wrote it down
But I can't find those pages anymore...

I know I dreamt of you
And that was before we met...
And I remember thinking how incredible it was,
It was incredible
'Cause we met. We met. We did meet,
Didn't we?

These are my memories,
They are not tarnished, cannot be
It does feel a bit disjointed,
Slightly fragmented...these memories
But that's because it has been awhile

I did want to forget
When you stood amongst my friends and mocked
me
How you laughed and called me insane
How could you
Call me insane?

Oh, no wait!
They said no one saw you
They say you were not there...
You were my imagination, my

Creativity running away with me...
And that I didn't just dream about you
They said perhaps...
Perhaps I dreamt you up but
I did have a dream
And I wrote it down...



রবি ঠাকুর
অমিত সেনগুপ্ত
(অকল্যাণ্ড)



‘তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে কোলকাতার নাগরিক সম্বর্ধনায় উচ্চারিত এই উক্তিটিতে তাঁর সম্পর্কে বাংলা ও বাঙালীর মনের কথাটি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তেমনটি বোধহয় আর কখনও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সত্যিই এক পরম বিস্ময়। আমাদের গভীরতম অনুভূতিকে আমরা যেভাবে মনের নাগালে পাই, ভাষার নাগালে সেভাবে সবসময় পাই না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমার সেই অবস্থাই হচ্ছে। মনের গভীরতম অনুভূতিতে তাঁকে যেভাবে পেয়েছি, তার প্রকাশসাধ্য ভাষা আমার নেই।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি পৃথিবীতে হয়তো জন্মেছেন। তার চাইতে বড় নাট্যকার অথবা ঔপন্যাসিক নিশ্চয়ই জন্মেছেন। একথা মেনে নিয়েও বলতে আমার দিখা নেই যে কাব্যে, নাট্যে, গল্পে, উপন্যাসে, চিত্রাঙ্কনে, সঙ্গীতে, শিক্ষাব্যবস্থায়, ধর্মচিন্তায়, জাতিগঠনে, বিশ্বমানবের ঐক্যসাধনে - একজন ব্যক্তি কোনো দেশের সাহিত্য, কলা এবং জীবনে এতটা স্থান অধিকার করেননি। প্রতিভার কোন কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের থেকে কৃতি ব্যক্তির স্বাক্ষর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং গ্যায়টে ছাড়া আর কারো সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে না। এবং সামগ্রিক বিচারে রবীন্দ্র-প্রতিভা পৃথিবীর যে কোন প্রতিভাকে অতিক্রম করেছে।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় নাটক দেখে খুব নিরাশ হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বন্ধুকে বলেছিলেন, ‘এই তোমাদের নাটক? রোসো, আমি লিখে দিচ্ছি।’ লিখলেন নাটক। একদিকে ট্রাজেডি, অপরদিকে কমেডি - এর কোনটাই আমাদের সাহিত্যে ছিল না। বাংলা সাহিত্যে সনেটের সৃষ্টি করলেন। গতানুগতিক ছন্দ থেকে বাংলা কাব্যকে অমিত্রাক্ষরে মুক্তি দিলেন। বাংলা কাব্য সাবালক হল।

রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সব্যসাচী। উপন্যাসে, সমাজবিজ্ঞানের প্রবন্ধে, ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায়, সাহিত্য সমালোচনায়, রসরচনায় সিদ্ধহস্ত ও পথপ্রদর্শক। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা কাব্য, সাহিত্য নবযুগের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তারপর এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বসাহিত্যের সুরের সাথে বাংলা সাহিত্যের সুরটি মিলিয়েছেন। সাহিত্যদেবীকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বলেছিলেন, ‘তোমার বিশ্বসাহিত্যের সুরের সাথে আমার বাংলা সাহিত্যের সুরটি

মিলিয়ে নাও।’ রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে আমরা বিশ্বসাহিত্যের রূপ দেখতে পেয়েছি। বর্তমানে পৃথিবীতে যে পাঁচ-ছয়টি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য আছে, বাংলা সাহিত্য তাদের সমকক্ষতা দাবী না করলেও তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলার সাহস অর্জন করেছে। আগে যা অসম্ভব ছিল, আজ তা সম্ভব হয়েছে। এই শক্তির সম্মুখীন রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বাধিক।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল - তিনি শুধু সাহিত্যই সৃষ্টি করেননি, সাহিত্যিকও সৃষ্টি করেছেন। ভাষার দৈন্য দূর করে সাহিত্যের রাজপথ নির্মাণ করেছেন। রাজপথে কেবলমাত্র রাজার রথই চলে না, পদাতিকেরও চলার অধিকার আছে। এই রাজপথে পদাতিকের চলাচল যত বেশী বাড়বে রাজপথের গৌরবও তত বেশী বাড়বে। চলাচলের সমস্ত বাধা তিনি দূর করে দিয়েছেন। অগ্রগতিতে আর কোন বাধা নেই। রবীন্দ্র পরবর্তী কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, চিত্রাঙ্কণে, সঙ্গীতে নতুন নতুন অভিযান সেই বাধাহীনতাই প্রমাণ করেছে। তিরিশের দশক থেকে আশির দশক এই পঞ্চাশ বছরকে আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগ বলা হয়। অতুলপ্রসাদ, নজরুল ও অন্যান্য কবির গান এবং আধুনিক বাংলা গানের বিকাশ এই রবীন্দ্রসৃষ্ট রাজপথেই হয়েছে এবং এই বিকাশের পিছনেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও অবদান রয়েছে। শিবের জটায় আবদ্ধ থাকাকালীন গঙ্গা পুণ্যসলিলা ছিলেন না - জটা মুক্ত হয়েই পুণ্যসলিলা হয়েছেন। রবীন্দ্র প্রতিভাও বাংলা সাহিত্য-কলা-সঙ্গীত বিকাশের রাজপথ নির্মাণ করে, অগণিত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে।

আমাদের সাহিত্য এবং ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে ইংরাজী সাহিত্য প্রায় চার-পাঁচশ বছরে ছোট-বড়-মাঝারি বহু লেখক এবং সাহিত্যিকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। আর বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় প্রতিভাবানের প্রচেষ্টায় কয়েক বছরে। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ শুধু একশো নয় - এক অক্ষৌহিণী। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য, কাব্য, কলা, সঙ্গীতকে এমন স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন যেখানে সে তার আপন পথ আপনিই করে নিতে পারবে।

সমাজে দুই ধরনের ঐতিহাসিকের সন্ধান পাওয়া যায় - প্রথাগত ঐতিহাসিক এবং অপ্রথাগত ঐতিহাসিক। প্রথাগত ইতিহাস লেখেন পণ্ডিত ব্যক্তির আরা অপ্রথাগত ইতিহাস লেখেন রসিক ব্যক্তির। প্রথম জনের কাজ রাজ্যের ভাঙাগড়া নিয়ে এবং দ্বিতীয় জনের কাজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ে। এই দ্বিতীয়টিই জাতির সত্যিকারের ইতিহাস। এখানেই থাকে মানুষের কান্না-হাসি, রাগ-রঙ্গ, হিংসা-বিদ্বেষ, স্নেহ-ভালবাসার কাহিনী। তা থেকেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। প্রথাগত ইতিহাস হাত-পা ছোঁড়াটাকেই দেখে। অপ্রথাগত ইতিহাস শুধু হাত-পা ছোঁড়াটা দেখেই ক্ষান্ত হয় না - কান পেতে তার হৃদ-স্পন্দনও শোনে। ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে যা লিখছেন তার কিছুটা উল্লেখ করছি।

‘ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহার আসিল, কাটকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে- ছেলে ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে - পাঠান-মোগল পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ... ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে। ... ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না - সেদিনও সেই ধূলি সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে জন্মমৃত্যু-সুখ দুঃখের যে প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতের কাছে সেই ঝড়টাই প্রধান ... কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই, সে বাহিরে। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না। ... মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনর সাম্রাজ্যগবোর্দার-কাল পর্যন্ত যাহা কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা মাত্র ... তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কি?’

দেশের কাব্য সাহিত্যই দেশের প্রকৃত ইতিহাস। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস হোমারের কাব্যে, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস রামায়ণ-মহাভারতে। শেক্সপীয়রের রচনায় ইংল্যান্ড ও ইংরাজ চরিত্রের যা পরিচয় পাওয়া যায়

ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত-সংমিশ্রণ, রীতি-নীতি, সংস্কার-ধ্যানধারণায় যে জাতীয় চরিত্র গড়ে ওঠে, সাহিত্যিক কবিরা সেই চরিত্রকেই ফুটিয়ে তোলেন তাঁদের সাহিত্যে, কাব্যে। সাহিত্যিক কবিরাই দেশের সত্যিকারের ইতিহাসকার। যে কারণে হোমার, বাল্মীকি, বেদব্যাস, শেক্সপীয়ারকে দেশের ইতিহাসকার বলা যায়, সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকার। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নন, সমস্ত ভারতবর্ষের মুখপাত্র। ভারতবর্ষকে জানতে হলে রবীন্দ্রনাথকে জানা এবং রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখা প্রয়োজন।

কোন সংকটমুহুর্তে জনচিহ্ন যখন বিশেষভাবে আলোড়িত হয়, তখন চৈতন্য, নানক, কবীরের মত মহাপুরুষ অথবা নেপোলিয়ন, গান্ধী, ম্যাণ্ডেলার মত রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব কোন বিচিত্র বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। মহাকবির জন্ম বা আবির্ভাব এমন ভাবে হয় না। মানুষের শিরায় শিরায় যেমন বহু পূর্বপুরুষের রক্ত প্রবাহিত, মহাকবির মনেও তেমন বহুযুগের ইতিহাস স্পন্দিত। দেশের ও জাতির মনের সঙ্গে মহাকবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের মনের সঙ্গে দেশের চিরন্তন মনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিলিতিয়ানার জোয়ার এসেছিল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর। রবীন্দ্রনাথের পিতা সেই হিন্দু কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। সাহেবিয়ানার পাঠস্থানে শিক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও সাহেবিয়ানা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। তিনি তাঁর পরিবারে শিক্ষার যে পরিবেশটি রচনা করেছিলেন তাতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলেও বিলিতিয়ানাকে এতটুকুও প্রশংসা দেননি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলনে যে আধুনিকতার সৃষ্টি হোল, তার জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। আধুনিকতার বঙ্গীয় সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথের বাল্য শিক্ষা হয়েছে এই রীতিতে। সেই কারণেই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত একান্ত আধুনিক মানুষ হয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশের চিরন্তন মনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছিলেন। গাছ যেখানে ডালপালা ছড়িয়ে দেয় সেখান থেকে সে আলো-বাতাস-সূর্য্যতাপ ইত্যাদি গ্রহণ করে। কিন্তু মাটির তলায় থাকে তার শিকড় - সেখান থেকে সে রস গ্রহণ করে। শিকড় উপড়ে নিলে আলো-বাতাস-সূর্য্যতাপ তাকে বাঁচাতে পারে না। মনের বিকাশ আর পরিপুষ্টির জন্য দেশের সংস্কৃতি রসের কাজ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং অন্য কোন পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রনাথকে এই শিকড় থেকে, দেশের চিরন্তন মন থেকে উপড়ে ফেলতে পারেনি। যৌবনে জমিদারী পরিচালনার ভার পড়ায় সত্যিকারের দেশকে দেখার সুযোগ পেলেন তিনি। দেখলেন বাংলা দেশের শস্যশ্যামলা মূর্তি, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, গঙ্গা-পদ্মার তীরবর্তী গ্রাম আর দেশের অসহায় মানুষকে। জানলেন মানুষের জীবন যাত্রা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাষা, সংস্কার, বিশ্বাস, তাদের দেবদেবী, পালাপার্বণ, আর শুনলেন এ সবকিছুর হৃৎস্পন্দন। এই সবকিছুর প্রতিই তাঁর কোঁতুলী দৃষ্টি ছিল। বঙ্গলক্ষ্মীর এই অপূর্ব শোভা তাঁকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল বলেই কোন পাশ্চাত্য শিক্ষাই দেশের চিরন্তন মনের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন করতে পারে নি। বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দেশকে, দেশের সংস্কৃতিকে গভীরভাবে ভালবেসে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ সে যুগে দেশের অতীতকে, দেশের সংস্কৃতিকে উপহাস করা যত সহজ ছিল, শ্রদ্ধা করা ততটা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি, দেশের সংস্কৃতির প্রতি এই শ্রদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের নির্বিচার দেশপ্রেমের আনুগত্য নয়, তাঁর কবি মনের স্বাভাবিক প্রবণতা।

দেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা না করে কোন কবি মহাকবি হতে পারেন নি। এমন কি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট যে মাইকেল, তাঁকেও হোমার, দান্তে, শেক্সপীয়ার ছেড়ে বাল্মীকির স্মরণাপন্ন হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কখনও দেশবাসীর সামনে দেশের অতীত পৌরবকে তুলে ধরেছেন, কখনও দেশমাতৃকার অন্তরের বেদনা ব্যক্ত করেছেন। সমস্ত কবির মুখেই অতিশয়োক্তি শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের মুখেও তা শুনেছি। ভারতমাতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি যখন বলেছেন - 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন' - তখন হয়তো অন্নের জন্য পরের দ্বারে ধরণা দিতে হত। যখন বাংলা মাকে বলেছেন 'সোনার বাংলা' তখন হয়তো অর্দ্রেক লোক পেট ভরে খেতে পেত না। তবে কি তিনি মিথ্যে বলেছেন? মোটেই নয়। অত্যুক্তি ভালবাসার ধর্ম। তিনি দেশের প্রতি যে ভালবাসা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে কোন কূপণতা নেই, আছে শুধু গভীরতা। কোন সন্তানই তার মাকে ছোট করে দেখে না।

লোক-সঙ্গীত কথা-প্রধান এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সুর-প্রধান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অসামান্য পাকিত্ব থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ স্বদেশী গানে সাধারণ মানুষের পরিচিত লোক সঙ্গীতের সুর-সংযোজনা করেছিলেন। স্বদেশী

আন্দোলনের যুগে তিনি যে চারণ কবির ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন এবং আন্দোলনকে তাঁর গান দিয়ে মাতিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, এটা তার একটা মুখ্য কারণ। বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী সুর ইত্যাদি দিয়েই তিনি তাঁর অধিকাংশ স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তার আপন মনের কথা, তার আপন ভাষা, আপন সুরে শুনতে পেয়েছিল। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল থেকে সে সঙ্গীত বেজে উঠেছিল। মনের গভীরতম সুখ-দুঃখ, অনুভূতি প্রকাশের শ্রেষ্ঠ ভাষা হল গান। কবিকেই তা সৃষ্টি করতে হয়। সুর যেখানে কথাকে পৌঁছে দিতে পারে, কথা পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছাতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসঙ্গীতজাত গান এত সহজ সুরে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে সে গান পথ চলতে, কাজ করতে, প্রেম নিবেদনে, দেশ প্রেমে, গৃহকার্যে, বিপ্লবে, বিদ্রোহে, পূজায়, দেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানাতে, প্রকৃতির উদ্দেশ্যে কিছু বলতে - সব কাজে মানিয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গানেই সর্বপ্রথম কথা ও সুর সমান প্রাধান্য লাভ করে। শুধু তাই নয় হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালগুলির সীমানা অতিক্রম করে তিনি সাতটি নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষাকে পুঁথির গভী থেকে, ধর্মকে শাস্ত্রের বন্ধন থেকে, রাজনীতিকে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে এবং সঙ্গীতকে ওস্তাদি ও কালোয়াতির প্রভাব থেকে মুক্ত করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম আমাদের শেখালেন গান ছাড়া কোন অনুষ্ঠান হয় না। বিয়ের শুধু মন্ত্র ছিল, গান ছিল না। এখন গান ছাড়া কোন বিয়ের অনুষ্ঠানই জমে না। জন্মোৎসব থেকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সব কিছুর জন্যই তিনি গান রচনা করেছেন। তাঁর গান ‘সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে’ গেয়ে বাঙ্গালী বীর ফাঁসির মধ্যে শহীদ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ‘এই কথাটি মনে রেখো’ গানের আইরিশ অনুবাদ গেয়ে আয়ারল্যান্ডের দুইজন বিপ্লবী ফাঁসির মধ্যে আরোহণ করেছেন। রাজনীতির রূপ সাধারণত কুৎসিত। সেখানেও যে সৌন্দর্য আনা যায়, বাংলাদেশই তা প্রমাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানই তার পথ নির্মাতা। সেই পথেই নজরুলের গানের যাত্রা এবং অগ্রগতি হয়েছে।

রাজনৈতিক হট্টগোলের মধ্যে যিনি সুরসংযোজনা করতে পারেন, সেই মানুষ যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, সঙ্গীতই যে তার বিদ্যা-আহরণের প্রধান বাহন হল তাতে আর আশ্চর্য্য কি। বিদ্যালয়ের কাজকে যেমন তিনি গানের সুরে মিলিয়ে নিয়েছিলেন, গ্রাম সংগঠনের কাজেও সঙ্গীতকেই তার বাহন বানিয়েছিলেন। গানকেই করেছিলেন তাঁর সমস্ত কাজের সহায়। তাঁর বিশ্বাস ছিল ‘গানের বেলায় যে গলা মিলাতে পারবে, কাজের বেলাতেও সে হাত মিলাতে পারবে।’ কোন জোর খাটাতে যান নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল - ‘আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাবো।’

আমাদের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা বেশী দিনের নয়। রবিঠাকুর নিজেই দুঃখ করে বলেছিলেন তাঁদের জন্য হয়েছিল নারীহীন সমাজে। নারীহীন সমাজ যে কতটা নীরস-নিষ্প্রাণ তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি জানতেন মেয়েদের অনুপস্থিতিতে ছেলেরা নিজেদের রুচি সম্পর্কে খুব একটা সচেতন থাকে না। শ্রীলতা-শোভনতা সব সময় বজায় রাখে না। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। ছেলে-মেয়েদের স্বচ্ছন্দ মেলামেশার পরই কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনায় সতর্কতা বৃদ্ধি পেল - জন্ম হল মার্জিত হিউমারের। সেই জন্মও রবিঠাকুরের কাছে আমরা অনেকটা ঋণী। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভদ্রসমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমবেত সঙ্গীত বা কোরাস গান প্রচলন করেছেন।

সাহিত্যিক ও কবিরাই দেশের ও জাতির সবচেয়ে বড় শিক্ষক। রামায়ণ-মহাভারতের কবি আমাদের আদি গুরু। সাহিত্যিক ও কবিরা সাহিত্য ও কাব্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশ ও জাতিকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথই পৃথিবীর একমাত্র কবি যিনি শুধু সাহিত্য ও কাব্য দ্বারা পরোক্ষভাবে নয়, বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেবার ভার নিয়েছেন। বালক বয়সে স্কুলে যাবার মর্যাদা সারা জীবন তাঁর মনে ছিল। স্কুল যাওয়ার নাম দিয়েছিলে দ্বীপান্তর বাস। তিনি ছিলেন ‘ইস্কুল পালানো ছেলে’। সেই ইস্কুল পালানো ছেলে বড় হয়ে নিজেই একটা ইস্কুল খুলে বসলেন। শান্তিনিকেতনের সব চাইতে বড় পরিচয় হল - এটা ইস্কুল পালানো ছেলের নিজহাতে গড়া স্কুল। এমন স্কুল বানাতে চেয়েছিলেন যেখানে ছেলেরা বাড়ি পালিয়ে স্কুল আসবে। হয়েছিলও তাই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আনন্দ দান। ইস্কুল পালানো ছেলের নিজহাতে গড়া স্কুলের শুধু প্রকৃতি নয়, তার আকৃতিও পালটে গেল। স্কুল বসল গাছের তলায়। গাছের ডালে ডালে যেখানে পাখি গান গায়,

গাছে গাছে যেখানে ফুল ফোটে - সেখানে মাষ্টার মশাইয়ের কর্কশ স্বর নিজের অজান্তেই নরম ও সুরেলা হয়ে যায়। পড়াশোনার মধ্যে সুর আর রঙের ছোপ লেগে যায়।

ছাত্রছাত্রীদের তিনি খেলা মাঠে ডেকেছেন ‘ছুটির নিমন্ত্রণে’। পাঠ্য বইয়ের নাম দিয়েছেন পাশের পড়া নয়, ‘ছুটির পড়া’। পড়া, কাজ আর খেলা এই তিনের ব্যবধান তিনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত ক্ষাপামিকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। তিনিই নাটের গুরু, ছেলে ক্ষাপানোর সর্দার। এই ছেলেমেয়ের দল তাঁর চারিদিকে না থাকলে ‘ফাল্গুনী’ লেখা হত না। সেই দিক দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই বিরাট সৃজনশীল কাজের অংশীদার। রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনকে গড়েছেন, শান্তিনিকেতনও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে গড়েছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বললেন - ‘ছাত্রছাত্রীদের শুধু ভালবাসলেই হবে না, তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। ছেলেদের আমরা নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে করি, কোন কাজেই ডাকি না। তাদের সহযোগিতা দাবি করি না। ... এরা কোন ব্যাপারে মালিকানা তো দূরের কথা, শরিকানা-স্বত্বও অনুভব করে না। ফলে জীবনকে, দেশকে এরা ভালবাসতে শেখে না। দেশের মাটির সঙ্গে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় না হলে শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য - দেশকে গড়ে তোলা - তা সম্ভব নয়।’ ‘ওদের (সাধারণ মানুষের) মুখে দিতে হবে ভাষা।’ সে ভাষা মুখস্থ করা ভাষা নয়, ধাতস্থ করা ভাষা। ভাষা বলতে উনি এখানে শিক্ষার কথা বলেছেন। বিদ্যা আহরণের বস্তু, শিক্ষা আচরণের। বিদ্যালাভ (মুখস্থ বিদ্যা) করলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না, বিদ্যা যখন ধাতস্থ হয় তখনই তাকে বলা হয় শিক্ষা। শিক্ষার ইমারত তিনি নিজ হাতে গড়েছিলেন। প্রয়োজনে গড়া জিনিষ ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন। পরবর্তীকালে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রীকে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রাজনৈতিক নেতাদের মত স্বদেশী আন্দোলনে তিনি কোন দিনই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু প্রথম দিকে কোলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশন গুলিতে তিনি যোগদান করেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ‘আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে’ গানটি রচনা করে নিজেই গেয়েছিলেন। এই অধিবেশনেই বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ গানটিতে সুরসংযোজনা করে তিনি গেয়েছিলেন। তবে কংগ্রেসী রাজনীতিতে কোনদিনই তাঁর বিশেষ আস্ত্র ছিল না, যদিও বিভিন্ন কংগ্রেসী সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল - ‘ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই। শিক্ষা স্বরূপ যতই অধিকার লাভ কর অন্তরের লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইবে না।’ রাজনৈতি শিক্ষাবৃত্তিকে তিনি ঘৃণা করতেন। রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা না নিলেও ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পর প্রকাশ্যে জ্বলে উঠছিলেন বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। তার কয়েক বছর আগেই বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সম্মান ঘৃণাভরে ত্যাগ করলেন। তখন তিনি লিখেছিলেন, ‘দেশের মানুষকে যারা সম্মান দিতে শেখেনি, তারা এসেছে আমাকে সম্মান দিতে। এদের দেওয়া সম্মানের মূল্য কি?’ রাজশক্তিকে উপহাস করে তিনি আরও লিখেছিলেন - ‘দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ, নাই পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে, সে আমারে গৃহ করে দান!’

স্বাধীনতার আগে দেশে বিদেশে স্বাধীনতার অনুকূলে মত গঠনের প্রয়োজন ছিল। সে কাজ রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে বেশী করেছেন। বক্তৃতা করে নয়, নিজ ব্যক্তিত্ব দ্বারা। দেশে বিদেশে জ্ঞানী গুণীরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন - যে দেশে এরকম মানুষের জন্ম হয়েছে, সে দেশ কিভাবে পরাধীন থকতে পারে? যারা সে দেশকে পরাধীন করে রেখেছে তারাই বা সভ্যতার দাবী করে কি ভাবে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মুখে বারবার শোনা গেছে - ‘ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সৃষ্টি-কর্তার এক কৌতুক বিশেষ। এ হেন ব্যক্তির জন্ম ইউরোপে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।’ আমেরিকান পণ্ডিত উইল ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন - ‘You are the reason why India should be free.’

আবির্ভাবকালে মহাকবি দেশের সংস্কৃতিকে যে অবস্থায় লাভ করেছিলেন তিরোধানকাল পর্যন্ত আপন সম্পদ দিয়ে তিনি সেই সংস্কৃতির অনেকটা শ্রীবৃদ্ধি করে যান। তাঁর আবির্ভাবকালে আমাদের সংস্কৃতি সবেমাত্র মধ্যযুগের চৌকাঠ পার হয়েছিল। তিনি একশো ঘোড়ার রথ চালিয়ে সেই সংস্কৃতিকে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দিয়েছেন। রবীন্দ্রসম্মানে পুষ্ট বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশ্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির অংশীদার, কারণ বিশ্ব সাহিত্য ভাষায় সে অনেক কিছুই দিয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির কাছে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঋণী, বাংলা সংস্কৃতিও তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ভীষণভাবে ঋণী।

*Wishing you all a
Happy Durgapuja & Dashera*

Spice Supermarket

P: 09 8151748

e: info@spicesupermarket.co.nz

www.spicesupermarket.co.nz

539 Sandringham Road,
Sandringham, Auckland

*Wishing you all a
Happy Durgapuja & Dashera*

TOP IN TOWN FOODCITY

Top in Quality, Top in service.

583 Sandringham Road, Sandringham, Auckland

09 8469009 Mob: 022 611 5163

- Free home delivery

Visit the shop and feel the difference

*conditions apply.

দৃশ্যগুলি কি চমৎকার

জয়ন্ত ভাদুড়ী

আকাশে শকুনের আনাগোনা সূর্য-মধ্যাহ্নগামী
মাটিতে ভিজে কান্না বাতাসে রক্তের গন্ধ—
তিনটি ছেলে শুয়ে আছে এখানে। -দৃশ্যটি কি চমৎকার।
গুদামগুলিতে পণ্যের আধিক্য।
ইঁদুরেরা ক্রমশঃ জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে।
আলীবাবার মত ভাগ্যবান লোকেরা
গুপ্তদরজা দিয়ে রক্তগুহায় ঢুকে পড়েছে।
আর অভুক্ত তিনটি ছেলে শুয়ে আছে এখানে
- দৃশ্যটি কি চমৎকার।
শিতাপানিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল কক্ষ।
চাঁদের আলোয় উজ্জ্বলমুখে নিশ্চিন্ত সব জীবনের আশ্বাস।
আপ্লয়ে নারী ও পান পাত্রে তারা বিপ্লবী ইন্ধন পায়।
এবং তাজা তিনটি ছেলে শুয় থাকে এখানে।
--দৃশ্যটি কি চমৎকার।
একদিন আমরা এই দৃশ্যগুলি বদলে দেব।
শয়তানের দল নদীর ধারে চড়ুইভাতি করে।
ওরা প্রায়শ্চিত্ত করবে ঐ নদীর জলে, পাতালে।
নতুন করে বেঁচে উঠবে তিনটি ছেলে।



সেথায় সেইখানে

জয়ন্ত ভাদুড়ী

আমি আবার সেখানে যেতে চাই
গ্রামে, যেখানে বাড়ীতে বাড়ীতে ধানের মরাই।
উৎসব ঘরে ঘরে মুখর নবান্নে গানে
দূরের পথে যেতে বাউল গহন অন্বেষণে।
থড়ে ছাওয়া কুঁড়ে মাটির সিনহাসন
দিনমানে চাষের পর মানুষের সাক্ষ্য জীবন।
আরতি মন্দিরে মন্দিরে - দেবালয়ে
চাষীবউ ভাত রাঁধে বুকে আলো নিয়ে।
ছোট ছোট সুখ দুঃখ ছোট জীবনে
আমার কবিতার নবজন্ম সেথায়, সেইখানে।

কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র

অনিল্য ঘোষ

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী-বাংলার অবিংসবাদী বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের ৫৫-তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে এলেন অহিংসার পূজারীর প্রদেশ, গুজরাতে। এ, ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারন সেদিনই মিলিত হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দুটি পৃথক ধারা এবং কংগ্রেস তথা ভারতের দুই প্রজন্ম।

হরিপুরায় সেদিন কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি বাংলার বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে যাওয়া হল একাঙ্গটি সাদা গরুতে টানা রথে। এ যেন কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ ভারতের সাথে নগর ভারতের মিলন। ভারতীয় কংগ্রেসের তাবড় নেতাদের মধ্যে মঞ্চ আলো করে বসে আছেন ভারতীয় রাজনীতির দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক – মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র বসু। মুক্ত হোল লক্ষ লক্ষ দেশবাসী – বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে ঠিক এই রকম এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী মঞ্চ দেখতে পাওয়ার আশায়, তারা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর এই মহান ব্যক্তিত্বের সুদীর্ঘ কার্যবিবরণী, ভাবনা এবং জীবনকে এই স্বল্প পরিসরে তুলে ধরে একেবারেই অসম্ভব। তাই জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তাঁর সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত কার্যকলাপ, দূরদর্শিতা, আত্মপ্রত্যায় ও দার্শনিক ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই নির্বন্ধে। আজকের বর্তমান ভারত ও ভারতের নানা সমস্যা সম্পর্কে এই দূরদর্শী আধুনিক মহান নেতার ভাবনা ও

কার্যকলাপ কতখানি প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের পথ কি হবে (?), সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজির মতপার্থক্য শুধুমাত্র এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাধীন ভারতের চিত্রটি ঠিক কেমন হবে সেই প্রসঙ্গে ভাবতা গিয়ে সুভাষচন্দ্র যে শিল্পসম্পদ-আধুনিকতার যা চিত্রটি কল্পনা করতেন, গান্ধীজির রামরাজ্যের সাথে তা কোন মিল ছিল না। গান্ধীর রামরাজ্যের যেখানে মহাকাব্যিক রাজার অনুশাসনে স্বনির্ভর এবং স্বশাসিত গ্রাম্যজীবনের ছবি ফুটে উঠত, সেখানে সুভাষচন্দ্রে স্বাধীন ভারতের ছবিটি ছিল স্বরচিত এমন এক ভারতের যেখানে কৃষি ও শিল্পের সমান উন্নতি ও দেশবাসীর আর্থিক-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও পূর্ণ স্বাধীনতা। তবে সব সব কিছু ছাপিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল সাদৃশ্য। সব কিছু দূরত্ব অতিক্রম করেও তাঁদের দুজনের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল।

সেই সময়ের ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খুবই জটিল। জাতীয় কংগ্রেসের উচ্চসারির নেতৃবর্গ এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় তখন গান্ধীবাদেরই সংখ্যা গরিষ্ঠতা। দেশের ধনতন্ত্রের দিকপালদের বদান্যতাই তাদের আর্থিক ভরসা। তাই গান্ধীকে পাশে নিয়ে সুভাষচন্দ্র যতই এক সঙ্গে কাজ করার প্রয়াস করুক না কেন, গান্ধীর অনুচরেরা বাংলার এই বিপ্লবী নেতাকে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। সেই সময় রাজনৈতিক আদর্শের সাদৃশ্যের কারনে কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবমুখী ও বাম মতাদর্শের ভিত্তিতে এক গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল, যার প্রধান মুখই ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল নেহরু। এদিকে জয়প্রকাশ নারায়ণের মত কয়েকজন সমাজবাদী, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি তৈরী করে ফেলেছেন, আবার কমিউনিজমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মত বামপন্থীরা এক নতুন বাম্পন্থী ধারা তৈরী করলেন “র্যাডিকেল হিউম্যানিজম”।

গান্ধী অবস্য খুব সুচতুরভাবে প্রথমে জওহরলালকে এবং পরে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই ‘বামবাদ’কে প্রত্ৰহত করার চেষ্টা করলেন। সেই সময় প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রধান বা সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলে অভিহিত করার প্রথা

ছিল এবং তার তুল্য শ্রদ্ধাও তাঁকে করা হতো। জয়াহরলাল সভাপতি থাকাকালীন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমটির সাথে নানাবিধ মতান্বেষণে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং ইস্তফাও দিয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত দলীয় পথে ফিরে এসেছেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে তাঁর পূর্বসূরীর অনুস্মরণ করবেন না – পিতৃপ্রতিম কংগ্রেসের অবিসংবাদী ব্যক্তিত্বের প্রতি এতটা অনুগত দেখাইবেন না, তা বলাই বাহুল্য। তাই গান্ধীর পক্ষে সেদিন বাংলার এই বিপ্লবী নেতাকে সামলানো ছিল অনেক কঠিন কাজ।

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বের পর এই প্রথম বাংলার এক তরুণ বিপ্লবী নেতা জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। সেদিন হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতায় পাওয়া গেলো তাঁর আদর্শের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব বিষয়ে তাঁর ভাবনা এবং স্বাধীন ভারতের আর্থসামাজিক ভবিষ্যত বিষয়ে তাঁর চিন্তা। তিনি ব্রিটেনের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার শক্তি ও দুর্বলতার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করলেন। চ্যালেঞ্জ জানালেন বৃটিশ শক্তিকে স্বাধীন “স্বাধীন দেশসমূহের ফেডারেশন” তৈরীর লক্ষে। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের পর যে “কমনওয়েলথ” তৈরী হয়, তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই ধারণার অদ্বুত মিল দেখতে পাই। লেনিনকে উদ্ধৃত করে তিনি বললেন, “ব্রিটেনের নিজের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়েছে কেবল অন্যান্য দেশগুলিকে শোষণ করে। তাই আজ ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই বা সারা বিশ্বে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, তা আসলে ঘটনাচক্রে ব্রিটিশ নাগরিকদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে লড়াই”। তাই তিনি তখন গোষণা করেছিলেন, “যখন আমরা সত্যিকারের আত্মশাসনের অধিকার লাভ করব, তখন ব্রিটিশদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কের আর কোন বাধা থাকবে না”। বৃটিশদের হাতে চরম লাঞ্চিত হয়েও তিনি সেদিন কিন্তু বৃটিশদের বিষয়ে তীব্র তিক্ততার তিক্ততার কথা বলেন নি তাঁর ভাষণে। তবে তিনি সহযোদ্ধাদের সতর্ক করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ শক্তিকে বিভক্ত করার জন্যে। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন “ডিভাইন অ্যাওরুল” নীতিটি শাসকশক্তির জন্যে কোন আশাবাদী নয়। সুভাষচন্দ্রের মতে ব্রিটিশ ভারতে একদিকে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি আর অন্যদিকে স্বৈরতন্ত্রী

রাজাদের পাশাপাশি অস্থিহের মাঝেই রয়েছে বিভাজন নীতি। তাই তিনি সেদিন কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীদের আল্লাতান্ত্রিক চরিত্রটি পাল্টানোর অনুরোধ করেন পাশাপাশি ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটির বিরোধিতা করেন। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব খারিজ হলেও অন্য কোন পথে ব্রিটিশ যে ভারত বিভাজনের চেষ্টা করবে, যাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের গুরুত্ব হ্রাস করা যায়, সে বিষয়েও তিনই সুস্বীকৃত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক পারদর্শিতা ছিল তাঁর সমসাময়িক নেতাদের তুলনায় অনেক বেশী। একই সাথে তিনই উপলব্ধি করেছিলেন—ভারত, আয়ারল্যান্ড, প্যালেস্টাইন, মিশর, ইরাকে ধর্ম ও অন্যগোষ্ঠি পরিচয়ে বিভাজন নীতি চালু করে, ব্রিটেন নিজেই রাজনৈতিক দ্বিচারিতায় বিভ্রষ্ট হয়েছে। আর ঠিক এই কারণে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের কাছে তিনই আবেদন করেন, ভারতের সংখ্যালঘুদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে। ধর্ম-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে—বাঁচো ও বাঁচতে দাও—এই ছিল সুভাষচন্দ্রের নীতি। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি তিনই একবারও ব্যবহার করেন নি, কারণ তিনই জানতেন ধর্মবিশ্বাস ভারতীয়দের কাছে কতটা ব্যক্তিগত এবং জরুরী। তাই তিনই ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কখনও পাঁচিল তুলে দেননি বরং সব ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর অঘাঘ শ্রদ্ধা। “অনগ্রসর জনজাতী”র জন্যে সুবিচার অত্যন্ত জরুরী, তা তিনি অবগত করেন সেদিনের সেই হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে। ভারতের ঐক্য সাধনের পথে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সমাজকে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা প্রদান এবং একই সাথে প্রশাসনিক বিষয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে, তাদের জাতিসত্তাকে সম্মান প্রদান করা, অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করতেন সুভাষচন্দ্র। বর্তমান ভারত ও বিশ্বরাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের এই মতামত এবং বক্তব্য কতখানি প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য তা বলা বাহুল্য। একই সাথে পর-সম্প্রসূতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধাশীলতা প্রকাশ পায় তাঁর এই বক্তব্যে। নেহেরু-প্যাটেলদের একমাত্রিক জাতির ধারণা ও নানা ভাবধারার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে এসেও এঁরা সাংস্কৃতিক এবং ধর্মের বৈচিত্র্যতা বিষয়ে ছিলেন অসহিষ্ণু। এমনকী উদার মনের অধিকারী বলে পরিচিত, গান্ধীজিও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে এতটা উদার হতে পারেন নি। তাই সংখ্যালঘু প্রসঙ্গে বা

হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রতিষ্ঠাতে বারে বারে সংগ্রাম করতে হয়েছিল জাতির জনককে। সুভাষচন্দ্র বসুর প্রথম থেকেই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারে সংখ্যালঘুর সম্মানরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। নানাবিধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য কোনভাবেই বৃহত্তর জাতিসত্তার ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের জন্যে ভারতীয়রা যদি প্রস্তুত থাকে, তবে এই-ই হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের জন্যে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রকৃষ্ট সময়। স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে কর্মপন্থা তৈরীর এক প্রস্তাবও তিনই রেখেছিলেন হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের পতনের পর, স্বাধীন দেশে পুনর্গঠনের প্রধান সমস্যাই হবে দারিদ্র-দূরীকরণ। কৃষিভিত্তিক ভারতে কৃষি ব্যবস্থা এবং ভূমি সংস্কার এক অন্যতম জরুরী বিষয় বলে মনে করতেন সুভাষচন্দ্র। তিনি আরও বলেন যে জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে জমিব্যবস্থার প্রভূত সংস্কার করতে হবে। শুধু কৃষির উন্নতি সাধনে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় তাই কৃষির পাশাপাশি সরকারের নেতৃত্বে শিল্প-স্থাপনের বন্দোবস্ত জরুরী। আধুনিক শিল্পসভ্যতা ও তার সাথে যুক্ত অনাচারের বিরোধিতা করলেও বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের প্রসার অনস্বীকার্য। তাঁর মতে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত কোন যোজনা কমিশনের উপদেশ অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোটা দেশের কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা চেলে সাজাতে একটা সার্বিক রূপরেখা তৈরী করুক। তবে হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল স্বাধীন ভারতের কর্মপন্থা অনুযায়ী প্রধান কাজ হিসাবে “জন্ম-নিয়ন্ত্রণ”-এর প্রস্তাব। তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক নেতা, যিনি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে ভারতীয়রা সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় শিশুর জন্ম দেয় এবং বেশীরভাগ শিশু বাল্যেই মারা যায়। অপুষ্টি ও নানাবিধ রোগ, চিকিৎসার অভাব কেড়ে নেয় বেশীরভাগ শিশুর প্রাণ। এই কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ ভারতের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। গান্ধীজী বলেছিলেন স্ব-নিয়ন্ত্রণের কথা। কিন্তু দূরদর্শী-বাস্তববাদী-সচেতন সুভাষচন্দ্র জোর দিয়েছিলেন জন্মনিয়ন্ত্রণে। তিনই বলেন, “যতদিন নয় আমরা বর্তমান জনসংখ্যার

জন্য ঠিকমত খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারছি, ততদিন জন্মনিয়ন্ত্রণের থা ভাবাই বাঞ্ছনীয়”। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর ব্যাপারে জোর দিয়ে এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের কথা বললেন তিনি। ভারতের এই আধুনিক ও দূরদর্শী নেতার এই অসামান্য দূরদর্শিতা এবং ভাবনা যে কতটা প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আজকের ভারত এবং সারা বিশ্বে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করলে তা বোঝা যায়। এই জাতীয় পুনর্গঠন কাজে কংগ্রেসের যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকবে, তা মনে করতেন সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজীর সাথে এই ব্যাপারে তাঁর মতানৈক্য ছিল, কারণ গান্ধী মনে করতেন স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেসের অবলুপ্তি ঘটুক। কিন্তু সুভাষচন্দ্র মনে করতেন স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের পুন-গঠনে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। তা ছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত কতৃষ্ণবাদী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র হবে না। ভারত চলবে গনতন্ত্রের পথে, যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষই নেতা নির্বাচিত করবে। কংগ্রেসদলে গনতন্ত্রের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন। দলে অন্যান্য শাখা সঙ্গঠনের, যেমন কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির সরাসরি অন্তর্ভুক্তি চাইতেন তিনি, যদিও কংগ্রেসের পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর নেতৃবর্গের তাতে কোনরকম সায় ছিল না।

আর একটি বিষয়ে কংগ্রেসের এই অধিবেশন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। টা হোল পরাধীন দেশের বিদেশ-নীতি। তিনি হরিপুরা অধিবেশনে প্রস্তাব রেখেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার জন্যে। এই ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল, “ভারতের বিদেশনীতি কখনই অন্য কোন দেশ বা বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুসৃত নীতি দিয়ে নির্ধারিত হবে নয়। ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে সহমত পোষণকারী এবং সমব্যাপী পৃথিবীর সব দেশেই আছে এবং তাঁদের সেই সমর্থনকে কাজে লাগাতে হবে। বিশ্বের সর্বত্র ভারত বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ তৈরী করতে হবে”। তিনি বললেন, “ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শুধু ভারতের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই নয়, তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তাই ভারতের স্বাধীনতা লাভেই বিশ্বমাতার পরিত্রাণ”। বিশ্ব মানবিকতা এবং বিশ্বভাতৃত্ব বিষয়ে তাঁর ভাবনা ছিল আধুনিক, উদার এবং সৌহার্দের মেলবন্ধন। ইউরোপে নির্বাসন কালে

বিভিন্ন দেশের নেতৃবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট উন্নত মানের ছিল, তাঁকে এবং আত্মপ্রত্যয়ী করেছিল।

এক কথায় হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে মাতৃভূমির সেবায় এগিয়ে আসতে এই বাঙ্গালী দেশপ্রেমিকের স্বতস্কূর্ত এবং আন্তরিক আহ্বান সেই দিন দেশময় জয়-জয়কার পড়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী কর্মপন্থা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের সেই প্রস্তাবিত বিষয়গুলি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক এবং দূরদর্শীপূর্ণ ছিল, সুধী পাঠকগণ আজ বর্তমান ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই অনুধাবান করতে পারছেন।

সুভাষচন্দ্র তখন আক্ষরিক অর্থেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক রাজনৈতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা। ইউরোপ ও আমেরিকায় তিনই সমানভাবে আলোচিত। তাঁর অসামান্য বাগ্মীতায় মুগ্ধ করেছেন আমেরিকা ও ইউরোপের মানুষকে। ১৯৩৮ সালে ৭ই মার্চ টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ছই এবং আলোচনা করা হয়েছে গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে। লেখাটার নামকরণ করা হয়েছে “Chariot of Freedom”। হরিপুরা কংগ্রেসের অ্যাজেণ্ডাগুলিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষে, ভারতের আর্থসামাজিক পূর্ণগঠনের পরিকল্পনা তৈরীর উদ্দেশ্যে বোম্বেতে তৎকালীন কংগ্রেস-শাসিত সাতটি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার প্রধানকে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের তিনি আহ্বান করলেন। উন্নত এবং আধুনিক ভারতের গঠনের জন্যে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা বিজ্ঞানের। তাই তিনি বিজ্ঞান সমাজের দ্বারস্থ হলেন। Indian Science News Association-এ তিনি বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান করলেন। বিদেশি শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, বেকার সমস্যার সমাধান, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞানের ভূমিকা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা জানাতে দ্বিধা করেন নি তিনি। দিল্লীতে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির শিল্প মন্ত্রীদের সভায় তিনি কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে ধার্য করেন “মহিলা-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবাই ভালো কাপড় পান, ভালো শিক্ষা পান এবং বিনোদনর সুযোগ ও অবসর পান। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতে উন্নয়নের স্বার্থে দরকার সঠিক ও সুপরকল্পিত বন্টনের, যার মধ্যে সাম্যবাদের ছাপ থাকবে।

সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর কুটির শিল্পের প্রসারে উৎসাহিত থাকলেও, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়নের যে প্রয়োজনীয়তা তা গুরুত্ব সহকারে সমর্থন করেছেন। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্রের কর্মসূচি অনুযায়ী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐক্য জরুরী নয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর ধর্মীয় ও ভাষাভিত্তিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে খমতার সঠিক বন্টন ও সম্প্রীতির প্রয়োজন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেণ্ডাগুলি রূপায়ণে গান্ধীর সহযোগিতার প্রচুর চেষ্টা করেছেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার প্রয়াস করেছিলেন। তিনি নিজে সমাজবাদী সমর্থক হলেও দলে বাম ও ডান, উভয় পক্ষকেই নিয়ে একসাথে নিরপেক্ষ ভাবে চলতেন। গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী নেতারা অভিযোগ তুললেন যে নাগরিক স্বাধীনতার নামে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের ভিতর শ্রেণীযুদ্ধ করতে চাইছেন। প্রবল বিতণ্ডার মাঝে সমাজবাদী সমর্থকরা সভা ওয়াকাউট করলেও সুভাষচন্দ্র কিন্তু সেদিন ছিলেন নিরপেক্ষ এবং উভয়পক্ষকেই বলার সুযোগ দিলেন। গান্ধী চাইলেন সমাজবাদী ও বামপন্থীদের দল থেকে বহিষ্কার করাতে। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন, যা গান্ধীবাদী কংগ্রেসীরা ভালভাবে নিলেন না। তাঁরা মনে করলেন সুভাষচন্দ্র দল ছাড়ার ইমকি দিচ্ছেন। তিনই বললেন যুক্তরাষ্ট্রীয় পন্থাবে তিনই এই কথা বলেছেন, কংগ্রেস ছাড়ার প্রশ্নই নেই কারণ কংগ্রেস তাঁর শ্বাসবায়ুসম।

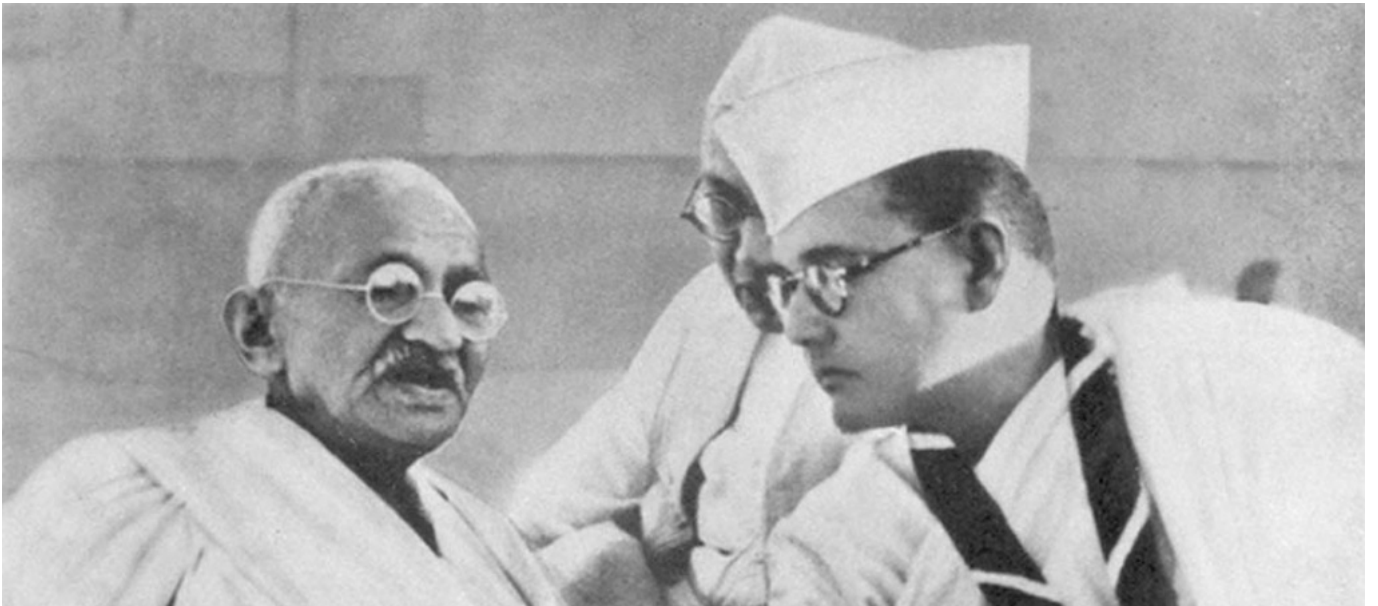
সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক পথ-আপোষহীণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সমাজতান্ত্রিক পথে স্বাধীন ভারতের পূর্ণগঠন ইত্যাদি বিষয়গুলি গান্ধী ও অনেক কংগ্রেসের পছন্দ ছিল না। আগামী সভাপতি নির্বাচনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ণনির্বাচনের জন্যে গান্ধীকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু গান্ধী তা অগ্রাহ্য করলেন।

জার্মানির একদল ব্যবসায়ী সাথে আলাপ পরিচয় করতে আসেন। বল্লভভাই প্যাটেল ঘনিষ্ঠ এক নেতা গান্ধীর কাছে অভিযোগ জানান যে সুভাষচন্দ্র জার্মান কনসালের সাথে বৃটিশদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে বৈঠক করেছেন। সেদিন সেই আলোচনায় তিনই জার্মান আগ্রাসন নীতি দিয়ে ঐ ব্যবসায়ী দলকে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আসন্ন কংগ্রেস সভাপতি

নির্বাচন ঘিরে সেবার রাজনৈতিক তরজা চরম আকার নিয়েছিল। সরদার প্যাটেল স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্রকে বলেন যে এই রকম পূর্ণবাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। গান্ধীপন্থী প্যাটেলদের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র জানালেন যে কংগ্রেসের সভাপতিকে নিজেদের হাতের পুতুল বানিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে চায়। সুভাষচন্দ্র এর প্রতিবাদে গান্ধীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্যে নির্বাচনে, গান্ধীর পার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করলেন এবং ১৯৩৯ সালের এই নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন। প্রমাণ হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা। সুভাষচন্দ্র কিন্তু অপ্রীতিকর সব কিছু ঝেড়ে ফেলে, কংগ্রেসের সব নেতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু গান্ধী পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সুভাষচন্দ্র ও সুভাষবিরোধীদের একই সঙ্গে স্থান হতে পারে না। মানোবেন্দ্র রায় গান্ধী সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি করে সুভাষচন্দ্রকে বললেন, গান্ধীর এই অযৌতিক আচরণের অর্থ কংগ্রেস নেতৃত্ব অটুট রাখতে সুভাষকে আত্মত্যাগে বাধ্য করা। সুভাষকে আর চাপে ফেলতে প্যাটেলের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীরা পদত্যাগ করলেন। শরৎচন্দ্র ও জয়াহরলাল নেহরু পদত্যাগ করলেন না। এই সময় ত্রিপুরী অধিবেশনে (১৯৩৯) শুরু হল। অসুস্থ সুভাষ সভাপতিত্ব করলেন। তিনই জানালেন যে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হবে, কাজেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন আরও জোরদার করতে হবে। তবে কংগ্রেসের গান্ধী কিন্তু এই অধিবেশনে যোগদান করেন নি। এই সময় দক্ষিণপন্থীরা, গোবন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বে প্রস্তাব আনলেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির

সদস্য মনোনীত করতে হবে গান্ধীর ইচ্ছা অনুসারে। বাম ও সমাজবাদী গোষ্ঠী সভা থেকে ওয়াকাউট করলে, দক্ষিণপন্থীদের একচ্ছত্র ভোটে গোবন্দবল্লভের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরা অধিবেশন ত্যাগ করলেন। সেদিন সুভাষের পক্ষে যিনি সচেয়ে জোর গলায় সমর্থন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশবাসীর মানসিক অবস্থা বুঝে সুভাষকে পদত্যাগ করার উপদেশ দিলেন। এরপর জয়াহরলালকে সঙ্গে নিয়ে সুভাষচন্দ্র দেখা করলেন গান্ধীর সাথে। কিন্তু গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। ১৯৩৯ সালের এপ্রিলে রাজনীতির ময়দানে গান্ধী সেদিন তাঁর কূটনৈতিক চালে সুভাষকে পরাজিত করলেন। এই হার যেন তাঁর জয়ের থেকে অনেক বেশী। তারুণ্যের চ্যালেঞ্জের কাছে সেদিন স্তান হয়েগিয়েছিল মহাত্মার মাহাত্ম্য। এই প্রবল, আত্মপ্রত্যায়া, দূরদর্শী বাস্তবিক নেতাকে দেশনায়ক উপাধি দিলেন গান্ধীর “গুরুদেব” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুভাষের রাজনীতির দীর্ঘকালের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়, কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁর কার্যকাল। বিরল দূরদর্শিতা এবং মানবতার এক মূর্ত প্রতীকি যা ততকালীন পরাধীন ভারতে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে এক অনন্য উজ্জ্বল অবদান হয়ে আছে। এমনকি বর্তমান ভারতের নানা সমস্যার প্রেক্ষাপটে, সেদিনের কংগ্রেস সভাপতি কর্মপন্থা, ভাবনা ও দূরদর্শিতা আজও কত প্রাসঙ্গিক এই স্বপ্ন পরসর নিবন্ধে তা তুলে ধরা চেষ্টা করা হয়েছে।



নানা স্বাদে পোস্ত

শ্রীমতী শিখা ভৌমিক

১) সজনা ডাটা পোস্ত

সামগ্রী: পোস্ত= ১৫০ গ্রাম, সজনা ডাটা= ২৫০ গ্রাম, বড় আলু= দুটো, সর্ষের তেল= ১৫০ গ্রাম, হলুদ= ২ চামুচ, নুন= স্বাদ অনুসারে, পাঁচ ফোরন= ১ চামুচ, শুকনো লঙ্কা= ১টা, চিনি= ১/২ চামুচ, সর্ষে= বড় চামুচের ১ চামুচ, নারকোল কুচি= বড় চামুচের ১ চামুচ, ও কাঁচা লঙ্কা ২ টো বা ৩ টো।

প্রণালী: প্রথমে ডাটা গুলি চিঁরে নিয়ে আগুনের সাইজ মত কেটে নিন। তারপর আলুর খোসা ছাড়িয়ে বড় বড় টুকরো করে কেটে নিন। এরপর পোস্ত, সর্ষে, নারকোল, কাঁচা লঙ্কা সব একসাথে বেটে নিন। তারপর কড়াইতে তেল দিয়ে, তেল গরম হলে পাঁচ ফোরন আর শুকনো লঙ্কা দিন, একটু ভাজা হলে তাতে আলুগুলো দিয়ে দিন। আলু একটু ভাজা হলে তাতে নুন আর ১ চামুচ হলুদ দিন। আলুটা ভাজা হয়ে গেলে, ডাটা গুলো দিয়ে দিন। ডাটা একটু নারাচারা করে, পোস্ত-নারকোল-সর্ষে-কাঁচালঙ্কা বাটা সব এক সঙ্গে দিয়ে দিন। তার পর বাকি ১ চামুচ হলুদ আর দরকার হলে (প্রয়োজন মত) নুন দিন। আলু ডাটা সিদ্ধ হওয়ার জন্যে পরিমান/আন্দাজ মত জল দিন। তারপর চিনি দিয়ে, মাখা-মাখা করে নামিয়ে নিন।

২) পোস্তের বড়া

সামগ্রী: পোস্ত= ২০০ গ্রাম, নারকোল কুড়ানো = ১০০ গ্রাম, বেসন= ৫০ গ্রাম, নুন ও লঙ্কা= প্রয়োজন মত, বেকিং পাউডার= চায়ের চামুচের ১/৪ চামুচ, কালো জিরা= ১ চামুচ।

প্রণালী: পোস্ত ও নারকোল ভালোভাবে গাড়ে করে একসাথে বেটে নিন। তারপর বেসন, নুন, লঙ্কা, বেকিং পাউডার ও কালো জিরা, বাটা পোস্ত-নারকোলের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ছোট ছোট বড়ার মত বানিয়ে কিছুক্ষন রেখে দেবার পর, (অন্তত ২৫০ গ্রাম তেলে) ডিপ ফ্রাই করুন। তারপর গরম ভাতে ঘি অথবা ডাল দিয়ে সবাইকে খেতে দিন। আপনিও খান। আশা করি ঘরের সবাইকার ভাল লাগবে।

৩) করলা পোস্ত

সামগ্রী:= ২ টো বড় করলা, আলু=২৫০ গ্রাম, পোস্ত ২০০ গ্রাম, নুন ও লঙ্কা স্বাদ মত, কাল জিরা=১/২ চামুচ, শুকন লঙ্কা=১ টা।

প্রণালী: প্রথমে করলা দুটো ছোট ছোট করে কাটুন। আলুর খোসা ছাড়িয়ে ডুমো-ডুমো করে কাটুন। পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কা একসাথে বেটে/পিসে নিন। কড়াইতে ১০০ গ্রাম তেল দিন। তেল গরম হলে, করলার টুকরো গুলো দিয়ে দিন। ১/২ চামুচ নুন ও ১/২ চামুচ হলুদ দিন এবং একটু বাদামী কালারের মত ভাজা ভাজা হলে, কড়াই থেকে নামিয়ে একটা অন্য পাত্রে রাখুন। তারপর ১/ চামুচ কাল জিরা ও একটি শুকন লঙ্কা দিয়ে ফোরন দিন। ফোরনটা একটু ভাজা হলে ৫০ গ্রাম সর্ষের তেল দিন। তেল একটু গরম হলে আলুর গুলো দিন। আলু ভাজা ভাজা হলে তাতে করলা আর বাটা পোস্ত একসাথে মিশিয়ে কড়াইতে ঢেলে দিন। তারপর ১ চামুচ হলুদ, নুন(স্বাদ অনুযায়ী) ও ১/২ চামুচ চিনি দিয়ে, একটু নারা-চারা করুন। তারপর (মাখা-মাখা রান্নার জন্যে)পরিমান মত জল দিন। আলু-করলা-পোস্ত, মাখা-মাখা সিদ্ধ হলে ও নামিয়ে নিন।

৪) পেঁয়াজ পোস্ত

সামগ্রী:= বড় পেঁয়াজ= ২ টো, পোস্ত= ১০০ গ্রাম, কাঁচা লঙ্কা ও নুন (স্বাদ অনুসারে) কালজিরা= ১/৪ চামুচ, ধনে পাতা।

প্রণালী: পেঁয়াজ দুটো পাতলা-পাতলা করে কেটে নিন। পোস্ত ভাল করে বেঁটে নিন। কড়াইতে ১ চামুচ তেল দিন। তেল গরম হলে ১/৪ চামুচ কাল জিরা ফোরন দিন। তারপর তেলে পেঁয়াজ দিয়ে যতক্ষন না পেঁয়াজটা বাদামী কালার হয়, ততক্ষন ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজ বাদামী কালার হওয়ার পর পোস্ত ঢেলে দিন। এর পর ১/২ চামুচ হলুদ দিন। স্বাদ অনুসারে লঙ্কা আর নুন দিন। পেঁয়াজ-পোস্ত একটু ভাজা-ভাজা হলে নামিয়া নিন এবং কুচি-কুচি করে একটু ধনে পাতা দিন।

আমাদের রান্নাঘর



চিরন্তনী - উত্তম কথা

উজ্জ্বল ঘোষ



প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে আমি নিজেকে

মোটাই যাকে বলে সিনেমার বিষয়ে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন একজন পন্ডিত বা চলচ্চিত্র শিল্পের বিদগ্ধ দর্শক বলে মনে করি না।

সবার কাছে সিনেমা শিল্পের ব্যাপারে নিজের জ্ঞান জাহির করাও আমার লক্ষ্য নয়।

জ্ঞানী চলচ্চিত্র দর্শক বা আঁতেল মার্কা ফিল্ম বোদ্ধাদের আপনারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন কলকাতায় নন্দন চত্বরে - সাড়ে সাত মাসের না কাচা জিন্স পরা আর গালে সাড়ে সাত বছরের না কমানো দাড়ি, গায়ে চক্কর বক্কর আঁকা বুলবুলে পাঞ্জাবি আর কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা টিপিকাল চেহারা হয় এদের ই নিজেদেরে এপিয়ারেন্স আরো ডাইনামিক করার জন্য এদের প্রায় সবারই কাঁধে অর্ধ লম্বা চুল! অনেকেরই আবার বাহু সংলগ্ন হিলহিলে চেহারার সুন্দরী সঙ্গিনী! লেখক সুনীল যেমন ভাবতেন - আমি সেই সময় ভাবতাম যে একটাই আশার কথা এমন সুন্দরী মেয়েরা নিশ্চয়ই এই সব ভন্ড আঁতেলদের কখনো বিয়ে করবে না।

যাক গে সে সব কথা - সিনেমা দেখার কু অভ্যেসটা কখন তৈরী হয়ে গিয়েছিল তার দিনক্ষণ আর আজ মনে নেই তবে শুরু কি ভাবে হল তা বেশ মনে আছে। দিনটা ছিল সরস্বতী পুজোর। তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আমরা নিজেরা সে বার প্রথম বারওয়ারী পুজো করছি। আমাদের মধ্যে দাদা গোছের একজন পান্ডা ছিল। দুপুর বেলায় তারই উত্সাহে আমরা দলবেঁধে সবাই গরিয়াহাটায় আলেয়া সিনেমায় হাজির হয়ে গেলাম। কুড়িয়ে বাড়িয়ে কোনো রকমে ৪১ পয়সা জোগার করে টিকেট কেটে ঢুকে পড়লাম অন্ধকার হলের মধ্যে। ছবির নাম "চৌরঙ্গী"।

সেই প্রথম দেখা - বয়সন্ধিকালে - তথাকথিত বড়দের সিনেমায় - বন্ধুদের সাথে - পর্দায় উত্তমকুমারকে।

বাড়ি ফিরে - রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে কেবলি একটিই মানুষ - সে উত্তম। তার আগে উত্তম নাম শুনেছি, খবরের কাগজে ছবি দেখেছি, সিনেমার পোস্টার বা বাড়ি আসা উল্টোরথ, সিনেমা জগতে বা নব কল্লোলের মত পত্রিকার পাতায় - কিন্তু ফিল্মে আগে কখনো নয়।

স্মরণে রাখা ভালো যে ছবিটিতে আরো দুই জন অতীব সুদর্শন বাঙালি অভিনেতা ছিল - বিশ্বজিত ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় - ছবিটির আসল নায়ক কিন্তু শুভেন্দুই। এত দিন পরেও উত্তমের সেই কালো স্যুট টাই পরা টান টান চেহারা - ব্যাক ব্রাশ করা চুল . মুখে বিশ্ব জয় করতে পারে এমন হাসি এখনো মনের মধ্যে খোদাই হয়ে রয়ে গিয়েছে - এত দিন পরেও সেই ছবিতে উত্তমের প্রথম সংলাপ আজও স্পষ্ট মনে আছে - "আসুন আসুন - হোটেল শাহজাহান মমতাজ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে"

বাকিরা কে কি বলেছিল - তা যে মনে নেই বলাই
বাহুল্য। এই হলো আমার প্রথম উত্তম দর্শনের স্মৃতি
- আমার কাছে যে স্মৃতি সততই সুখের।

.....
ছবি শেষ হয় - বাড়ি ফিতে আসি - উত্তম পিছু ছাড়ে
না। আধ ঘুমে মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে।
ঘরের জানালার ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে চাঁদ দেখতে
দেখতে কাব্যিক কিন্তু মারকাটারি রকমের স্মার্ট এবং
মনোরম উত্তম গেয়ে ওঠে - " বড় একা লাগে এই
আঁধারে - মেঘের খেলায় আকাশ পারে" - সমস্ত হল
ফেটে পরে দর্শকদের ' গুরু - গুরু ' উল্লাসে।

মান্না দেব গাওয়া এই অসাধারণ গানটি এক চিরস্থায়ী
ছবি সেই যে উত্তম হৃদি মাঝারে এঁকে দিয়ে গেল
আজ প্রায় ৪৬ বছর পরেও অমলিন রয়ে গেছে।
লিখতে বসেও মনে হচ্ছে আর কেউই কখনো
কোনো দিন বাংলা ছবিতে মহা নায়ক হতে পারবে না
- এই কথাটা জোর গলায় আজকের স্টারদের সামনে
বলে আসা যেতে পারে - কারুর মধ্যে সেই কারিশমা
বা X ফ্যাক্টর ব্যাপারটাই নেই।

এর পরই শুরু হয়ে হেল আমার উত্তম পরিক্রমা - শুধু
তাই নয় সিনেমা দেখার যে ঝোঁক বা ইচ্ছে তৈরী
হয়ে গেল মনে - তার শুরু এখান থেকেই।

যে সময়ের ছবি চৌরঙ্গী - তার অনেক আগেই বাংলা
সিনেমা জগত উত্তমকে মহানায়ক শিরোপা দিয়ে
দিয়েছে - ততদিনে উত্তম সত্যজিত রায়ের ছবিতে
অভিনয় করে ফেলেছে - এবং যুগপত ভাবে এন্টনি
ফিরিঙ্গী ও মানিক বাবুর চিড়িয়াখানা ছবিতে
অভিনয়ের সুবাদে - ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার
সন্মান - 'ভরত' পুরস্কার ও পেয়ে গেছে।

সে সময় বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত ৮০
শতাংশ কর্মী জীবন ধরনের জন্য উত্তমের ওপর
নির্ভরশীল। যে সময় আমি

চৌরঙ্গী ছবিটি দেখি - তার মুক্তি অন্তত বছর তিনেক
আগে হয়ে গিয়েছে এবং সেটি ছিল সুপার হিট
ছবিটির আলেয়া সিনেমাতে রি রান - - চৌঠা
সপ্তাহের।

তার পরের ছবি উজ্জ্বলা সিনেমায় দেখা " কখনো
মেঘ"। রহস্য রোমাঞ্চের ছবি - উত্তমের চরিত্র ছিল
একজন গোয়েন্দা

অফিসারের। দার্জেলিং এ কিছুটা শুটিং হয়েছিল -
মনে আছে - ম্যাল এর অপর রেলিং ঘেরা রাস্তা দিয়ে
হেঁটে আসা কালো স্যুট টাই ও চোখে রোদ চশমা
পরা উত্তমের চেহারাটা - ঠোঁটে আল্টো করে ধরা
ফিল্টার তিপ্পেদ সিগারেট - পিছনে স্বকীয় মহিমায়
কানচনজনঘা। বাংলা সাদা কালো ছবিতে এ রকম
হলিউড মার্কা স্পাস্ট এপিয়ারেন্স আজ অবধি তো
আর দেখতে পেলাম না - কারুর মধ্যে। হাঁ এখন
অনেক সুদর্শন অভিনেতা অবশ্যই আছেন বলিউড
বা টালিগঞ্জ কিন্তু তারা সব হয় জিম করা Rambo
টাইপের নয়তো একঘেয়ে রকমের অতি চালাক বা
নিতান্ত আটপৌরে লুক নয়তো কলেজের ভালো
ছেলে বা অতি সবজান্তা পশ্চাতদেশ পঙ্ক ধরনের
নয়তো একধরনের ধারালো চেহারা যা কয়েক ধরনের
ছবিতে হয়ত ঠিক আছে চলবে গোছের কিন্তু এমন
নয় যা দেখে যুবক যুবতীরা বলবে কি লাগছে গুরু -
ফাটাফাটি !

কাউকে দেখে মনে হয় না এ আমাদের মতন
মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালি - সুদর্শন অথচ চোখ খাঁধানো
রকম রূপবান নয় সুঠাম চেহারা (পাঁচ সাড়ে দশ - ৪৪
ইঞ্চি বুকুর ছাতি) অথচ জিম এ গিয়ে মাসল

ফোলানো নয়। স্মার্ট অথচ সবজান্তা পশ্চাত দেশ
পরিপক্ক নয়।

উত্তমের ছবিতে কাঁচা মুখ খিসতি বা রগরগে যৌন
দৃশ্য বা প্রগাড়া চুম্বন দৃশ্য কিছুই থাকত না কিন্তু ছবির
পর ছবি জুবিলী হয়ে যেত অনায়াসে - - গ্রাম গঞ্জ
মফস্সল, নগর, থানা, শহর উজিয়ে লোক আসত
সিনেম দেখতে - এখন তো তিন সপ্তাহ কোনো ছবি
চললে বলে ছবি হিট করেছে, শহরের লোকেরে
ছাড়া বিশেষ কেউই আর থিয়েটারে গিয়ে ছবি দেখে
না - ছবিতে রগগে দৃশ্য নাকি এটাই প্রমান করে বাংলা
ছবি এখন সাবালক - আন্তর্জাতিক!

সাদা কালো ছবিতে এতটাই দ্যুতিময় লাগত উত্তমকে
-যে পাশের সব অভিনেতা অভিনেত্রীকে ছাপিয়ে
চোখ ও মন দুইই টেনে নিত - কোনরকম গলাবাজি
বা অতি অভিনয় না করেই - এতটাই অমোঘ ছিল
উত্তমের স্ক্রিন প্রেজেন্স।

কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করলাম। আমার
সাহিত্যপাঠের গন্ডি বড় হলো চলচ্চিত্র বোধ উন্নত
হলো। বানিজ্যিক ছবি থেকে কিছুটা সরে এসে
ফেস্টিভাল, ফিল্ম ক্লাব ইত্যাদি জায়গায় নান ধরনের
ছবি দেখতে দেখতে ভালো ছবি, উচ্চকোটির ছবি
দেখার অভিলাষ বার্ল, অভ্যাস তৈরী হলো। অন্যান্য
অনেক অভিনেতাদের অভিনয় ভালো লাগতে শুরু
করলো। মানসিক ভাবে যথার্থ ভালো অভিনয় বিচার
ও উপভোগ করার ব্যাপারটা আপনাআপনি এসে
গেল বোধ বুদ্ধির মধ্যে - তা সে যেইই অভিনেতা হন
না কেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার অত্যন্ত প্রিয়
অভিনেতা হয়ে উঠলেন - কিছু কিছু ছবিতে
শুভেন্দুকেও বেশ ভালো লেগেছে। হিন্দি ছবির
ক্ষেত্রে দিলীপ কুমার, সঞ্জীব কুমার, কিছু ছবিতে
রাজেশ খান্না এবং ৭০ দশকের শেষ দিক থেকে আজ

অবধি একচেটিয়া বচ্চন সাহেব আমার হৃদয়ে নিজের
জায়গা চির কালের জন্য পাকা করে নিলেন।

কিন্তু বয়সনিক কালপর থেকে সমগ্র যৌবকালে উত্তম
পরিক্রমা পুরো মায়ায় সচল ছিল।

কত ছবিই না দেখেছি!

সুচিত্রা সেনের বিপরীতে - পথে হলো দেবী,
সপ্তপদী, সবার উপরে, বিপাশা, হারানো সুর,

অগ্নি পরীক্ষা, চন্দ্রনাথ, শিল্পী, সাড়ে ৭৪, অন্নাপূর্ণার
মন্দির, রাজলক্ষী ও শ্রীকান্ত, কমললতা, নাবারাগ, হার
মানা হার, প্রিয় বান্ধবী, গৃহ দাহ।

সুপ্রিয়ার বিপরীতে - কাল তুমি আলেয়া, সাবরমতি,
চিরদিনের, তিন অধ্যায়, দুই পুরুষ, সুন বরনারী,
জীবনমৃত্যু, মন নিয়ে, বিলম্বিত লয়, দুই পৃথিবী,
সন্ন্যাসী রাজা, জীবন জিজ্ঞাসা, আলাল পাথর, বন
পলাশীর পদাবলী, সোনার হরিন ইত্যাদি।

সাবিত্রীর সাথেও অসংখ্য ছবি - নিশিপদ্ম, কুহক,
মঞ্জরী অপেরা, মৌচাক আরো সব, অপর্ণার সাথে -
অপরিচিত, মেমসাহেব, কলঙ্কিত নায়ক, সোনার
খাঁচা, রাতের রজনীগন্ধা - এরকম বহু ছবি আরো
অন্যান্য নানান নায়িকাদের

সঙ্গেও।

যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন
যে কতটা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিয়ে
গিয়েছে উত্তম - কতটা বদলেছে। নিজেকে গড়ে
তুলেছে কত পরিশ্রম ও যত্নের সাথে - যে কলকাতা
পোর্ট কমিশনারস এর এক ছাপোষা কেরানি থেকে
একেবারে তৎকালীন বাঙালির হার্ট থ্রব ও বাংলা
ছায়াছবির চিরকালীন মহানায়ক হয়ে গিয়েছে।

সুচিত্রে সেন এর বিপরীতে উত্তমকে লক্ষ্য করুন -
সাড়ে ৭৪ এ থেকে হারানো সুর - এর মধ্যে সপ্তপদী,
পরে অগ্নি পরীক্ষা, এখানেই আমার কথাত
তাত্পর্যতা ধরা পড়বে। সুচিত্রা ছিলেন একেবারে
চোখ ধাঁধানো সুন্দরী - তার বক্তিত্ব, তার অহংকার -
তার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি শারীরিক বিভঙ্গ, গ্রীবার
হেলনে যেন উত্তমকে কিঞ্চিৎ হেয় করার মত একটা
undertone থাকত সুচিত্রার অভিনয়ে। উত্তম
ছিল ছাপোষা, কিন্তু পরিশ্রমী, সরল অথচ আত্মবিশ্বাসী
এক যুবক।

প্রথম দিকে সুচিত্রার সামনে উত্তমের অভিনয় ছিল
খুবই হিসেবী এবং অতন্ত্য সন্তুর্ণ। নিকেকে প্রকাশ
করেছিল একজন দায়িত্ববান পুরুষ হিসেবে - যে কিনা
সব সময় পাশে থাকবে, সাহস যোগাবে, যথাযোগ্য
মর্যাদার সাথে নিজের ভূমিকা পালন করবে জীবনে -
সর্বদাই সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে।

সেই উত্তম পরের দিকে এতটাই পরিনত হয়ে উঠলো
যে সুচিত্রা বিপরীতে তার **gait, body**
language, চলন, বলন, তাকানো, কামেরার
সামনে ঘোরা, হাঁটাচলা, কথা বলা সব যেন এটাই
বোঝাত - তুমি তুমি হতে পর - কিন্তু তোমার জন্য
আমার মত সুযোগ্য কেউ নেই আর কেউ হতে পারে
না। আমি আছি বলেই তুমি আছ।

বাঙালিও যেন বুঝে গেল সুচিত্রা মানেই বিপরীতে
উত্তম - এবং এতেই ছবির পর ছবি সুপারহিট।

মনে রাখা দরকার - দুজনের মধ্যে এই যে রসায়ন তা
কিন্তু সবটাই পরাবাস্তবীয় বা সুরিয়ালিস্টিক। কেউই
কিন্তু কাউকে কোনদিন সোচ্চারভাবে প্রসংসা বা
নিন্দে করেনি বা জনসমক্ষে মাখো মাখো গলা গলা
ভাবভালবাসা দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে রোমান্সের
জানান দেয় নি বা হোটেলে রাত কাটাতে গিয়ে ঝগড়া

করে থানা পুলিশের কেলেকারিতেও কোনদিন
জড়ায়নি।

সুপ্রিয়ার বিপরীতে আবার অনন্য উত্তম। সেখানে
উত্তম অনেকটাই **over powering** অথচ
sublime হিম্যান গোছের নায়ক। He man বলে
আবার উত্তমকে যেন ঘুঁসি মারামারিতে পারদর্শী নায়ক
ধর্মেন্দ্র'র সাথে মেলাতে যাবেন না। সে রকম যাতে
না ভাবেন তাই অনেক চিন্তা করে সুরিম্বে কথাটি
হেম্যান এর আগে বসিয়েছি। এখানে উত্তম অনেকটা
অভয় দেওয়া - আমি আছি তোমার জন্য - কোনো
চিন্তা নেই কেউ তোমার কিছুটা করতে পারবে না
ধরনের। অর্থাৎ আমি আছি তোমার জন্য - আমি
তোমায় ভালোবাসি - তোমার সব ভার আমার, সব
চিন্তা আমার ওপর ছেড়ে দাও - এই গোছের আর কি
।

সাবিত্রী - উত্তমের রসায়ন আবার পুরোপুরি আলাদা -
অনেক বেশি গেরস্থ সুলভ। সাবিত্রী যেমন একেবারে
গৃহবধু বা গৃহিনী

টাইপের - যেন জানিনা বাপু তোমার যা ইচ্ছা কর -
আমি পারব না আর উত্তম যেন বাড়ির কর্তা স্ত্রীর
উপর কোনো ভরসা নেই - ভাবখানা এই - দ্যাখো
দিকিনি - করলে কি হাঁ - তোমাকে দিয়ে কিছুটা হবে
না কি দেখি সরে যাও - যাও দেখি তুমি বরং এক
কাপ চা নিয়ে এস - এই রকম আর কি!

অপর্ণার বিপরীতে উত্তম আবার অনেকটাই
সফিস্টিকেটেড সাহেব, সোনার খাঁচা, রাতের
রজনীগন্ধা, কায়াহীনের কাহিনী, আলোর ঠিকানা
ছবিগুলিতে উত্তম অনেক শহুরে এবং **refined**।

অপরিচিত ছবিতে অপর্ণার সঙ্গলোভি
সফিস্টিকেটেড, বড়লোক, অথচ আদতে লম্পট ও
ভোগবিলাসী রঞ্জন কে ভোলা শক্ত।

যত বিশিষ্ট বাঙালি মানুষজনকে সারা পৃথিবী আইকন হিসেবে মেনে নিয়েছে তাঁদের মধ্যে উত্তম নিসন্দেহে অন্যতম। বিভিন্ন বিষয়ে - আধ্যাতিক থেকে বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক থেকে দার্শনিক, শিক্ষাবিদ থেকে ক্রীড়াবিদ, রাজনীতি থেকে অভিনয় আমরা জয়জন বাঙালি **ICON** কে পেয়েছি তার সংখ্যা বড় কম নয়। পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরত, বঙ্কিম, মানিক, বিভূতি, তারাশংকর, জগদীশ বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা হয়ে সত্যজিত, ঋত্বিক, মৃনাল, পন্ডিত রবিশঙ্কর, আলী আকবর খান, হেমন্ত, মান্না, সন্ধ্যা, প্রতিমা ছুঁয়ে যদি সৌরভ পর্যন্ত এসে যদি থামি তাহলে উত্তমের জায়গাটা বেশ অপরের দিকেই থাকবে।

উত্তম ছিল আদ্যন্ত বাঙালি - ধুতি পাঞ্জাবি ছিল তার প্রিয় পোশাক। সাদা আঙ্গুর পাঞ্জাবিতে সাদা কালো ছবিতে উত্তমকে দেখলে মনে হত এই শুভ্রতা শুধু ওকেই মানায়। তখন বাহারি রং বেরঙের দেসিগের পাঞ্জাবির পরার চল ছিল না। আজও পুরোন ছবিতে সাদা পাঞ্জাবিতে উত্তম কে দেখলে আমার মনে সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্তের গাওয়া 'পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি এবং দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক' এই গান দুটি জানিনা কেন মনে আসে বা 'এক গোছা রজনীগন্ধা গানটি'

অলীক কল্পনায় আমি যেন দেখি উত্তম সাদা পাঞ্জাবি পরে গানটি গাইতে গাইতে (হাতে রজনীগন্ধা অবশ্যই - কপালের ওপর কিছু চূর্ণ কুণ্ডল **carefully careless** হয়ে পরে আছে) ধরা যাক একজন স্মার্ট সুন্দরী নায়িকা হয়ত বা অপর্ণা সেনের জন্মদিন এর পার্টি থেকে বেরিয়ে আসছে।

সাদা কালো সিনেমায় উত্তমের দিব্যকান্তি চেহারাটা অসাধারণ সৌন্দর্যের আবেদন নিয়ে ধরা দিত - তার সাথে ছিল তার ভুবন ভোলানো সেই অমলিন হাসি। এত সুন্দর যে মেন হত বুঝি বা কামেরার লেন্সের ভিতর অবধি সেই হাসির অদ্ভুত সম্মোহনের কিরণ যেন পৌঁছে যাচ্ছে। লক্ষ্য লক্ষ্য যুবতীদের মাথা যে তাতে ঘুরে গেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে তিনি একবার উত্তমকে বলেছিলেন - " দাদা - তুমি যদি মানুষ খুন করে এসে আমার সামনে দাড়িয়ে বল যে তুমি খুন করেছ - তোমার হাসিটা দেখলে আমি কখনো সে কথা বিশ্বাস করতে

পারব না।

যে কোনো মেকআপ এ উত্তম কে পর্দায় দুর্দান্ত লেগেছে - কবিরাজ এন্টনি ফিরিঙ্গি, সন্ন্যাসী রাজাতে ভাওয়াল সন্ন্যাসী, চিড়িয়াখানাতে জাপানি

Photographer , যদি জানতেম এর প্রৌড় ব্যারিস্টার বা ভোলা ময়রার রূপসজ্জায়, এখানে পিঞ্জরের মধ্য বয়েসী দায়িত্ববান নিয়ান্ত ভদ্রলোক স্কুল মাস্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাভর্তন এ রাইচরণই হোক বা একেবারে প্রায় মেকআপ ছাড়া পুরোপুরি নিজের চেহারায় সত্যজিতের 'নায়ক' ছবিতে যেমন.

ধুতি পানাজাবি পরা আদ্যন্ত বাঙালি উত্তম আবার যখন সাদা শাট, টাই, কালো সুট পরা চেহারায় পর্দায় হাজির হত তখন এরকম **smart polished** চেহারার যে সুদর্শন বাঙালিকে তখন বাঙালি ফিল্মের দর্শক দেখেছে - আজ অবধি সেরকম আর দেখা গেছে কি?

উত্তম ছিল মূলত রোমান্টিক অভিনেতা। ক্রমে ক্রমে বয়সের সাথে বহুমুখী এবং বিচিত্র ধরনের চরিত্রাভিনয়ে সরে আসছিল। রোমান্টিক হলেও

অভিনয়ের পরিধি ছিল বিস্তৃত এবং অভিনেতা হিসেবে উত্তম ছিল একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কুশলী শিল্পী।

জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থেকেও উত্তম খলচরিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছে - কুহক ও শেষ অঙ্ক ছবিতে। নিজের চোখ ও হাসিকে উত্তম নিপুণভাবে ব্যবহার করেছে পর্দায়। কুহক ছবিতে গোপাল ঠাকুরের রূপে উত্তমের নির্মল হাসি নিমেষে বদলে যায় ভিলেন এর হাসিতে - যারা ছবিটি দেখেছেন তারা মনে করতে পারবেন।

কোথায় কতটা কেমনভাবে হাসলে, কামেরার সামনে কেমনভাবে দাঁড়ালে এবং তাকালে - হাসিটা নির্মল ও সরল হবে বা কখনো দুষ্টি কখনো মিষ্টি কখনো আত্মবিশ্বাসী, কখনো স্নেহশীল হবে - এই ভাবপ্রকাশের এবং মুহূর্তের মধ্যে তাকে বদলে ফেলার এক অসামান্য মুন্সিয়ানা তার মধ্যে ছিল। তার কন্ঠস্বর যুগপত ভারী, ওজনদার, রোমান্টিক ও আবেদনময় - সাংঘাতিক voice modulation এর ক্ষমতা ছিল উত্তমের। উচ্চারণের জড়তা ছিল কিছুটা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মত ধারালো, মর্মভেদী, ঋজু, কন্ঠস্বর বা পরিশীলিত বাচনভঙ্গি উত্তমের ছিল না - উত্তম আদতে একটু বোধহয় তোতলা ছিল কিন্তু গভীর দৃশে সংলাপ বলার সময় উত্তম তাঁর এই shortcoming বা দুর্বলতাকেই নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছিল - উত্তমের সংলাপ delivery প্রায়শই বুকের মধ্যে মোচড় তুলে দিত। কন্ঠস্বরের ওজন ও রোমান্টিক আমেজ এত চমত্কার ছিল বলেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান উত্তমের Lip Synch এ অসামান্য হয়ে উঠত। মনে হত যেন ও নিজেই গাইছে।

Lip Synch এর ব্যাপারে উত্তম ছিল একেবারে একেশ্বর। সারা পৃথিবীতে এতাবত চলচিত্রের ইতিহাসে উত্তমের মত Lip Synch এত নিখুত ভাবে কেউ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

জীবন মৃত্যু ছবিতে মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "কোনো কথা না বলে শুধু গান গাওয়ার ছলে" গানটির দৃশ্য You Tube এ দেখে আমার কথাটা মিলিয়ে নিতে পারেন।

মান্না দে একটি টেলিভিশন সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে একদিন বোম্বেতে উনি গাড়ি করে রেকর্ডিং এ যাচ্ছিলেন। ট্রাফিক সিগনালে ওনার গাড়ি দাঁড়াতে জানলা দিয়ে

দেখেন ক্রসিং এ উত্তম দাঁড়িয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে বিড় বিড় করে আপনমনে কি যেন বলে চলেছেন। উনি তখন গাড়ি থেকে হাঁক দিয়ে বলেন - 'কি ব্যাপার উত্তমবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে? কোথায় চললেন?' (বোম্বেতে তখন উত্তমকে কেউ খুব বেশি চেনে না তাই ওখানে উত্তম রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে পারত) উত্তম মান্না দেকে বলে - 'এই যে মান্নাবাবু কি যে সব সুর লাগিয়েছেন এন্টনি ফিরিস্পির গানে সেগুলোই রপ্ত করার চেষ্টা করছি - আমায় তো গানগুলোতে লিপ দিতে হবে '। এরকমই ছিল উত্তম।

অভিনয়কে উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই যে নিরলস প্রচেষ্টাটা উত্তমের জীবনের শেষ শট দেয়া অবধি ছিল। ওগো বধু সুন্দরী ছবিটির ওই যে দাড়ি কামাতে কামাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার দৃশ্য বোধহয় ২০ বার take এর পর উত্তম সন্তুষ্ট হয়েছিল। অথচ চার পাঁচ বার করার পরেই পরিচালক বলেছিল - দাদা খুব ভালো হয়েছে আর take করা দরকার নেই। কিন্তু উত্তম শোনে নি। সেই সময় অর শরীরটা ভালো ছিল না, অত্যধিক পরিশ্রমের ধকল আর নিতে পারেনি। সেই রাতেই ওঁর হার্ট এটাক হয়।

আর তারপর বাকিটা তো ইতিহাস!

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা তুলে দিচ্ছি - "অভিনয় জীবনের গোড়ার দিকের ছবি "চিরকুমার সভা" তে উত্তমের অভিনয় ছিল অসাধারণ - চলচ্চিত্র জীবনের একেবারে শেষের দিকের ছবি "নগর দর্পনে" ছবিতেও একই দক্ষতায় অভিনয় করেছেন। এই অভিনয় স্মৃতির মনিকোঠায় লালনযোগ্য"।

উত্তম বড় স্টার হবে না অভিনেতা হবে এই মানসিক দ্বন্দ্ব স্বতেও একই সঙ্গে উঁচুদরের অভিনয়ও করেছে আবার গ্লামরের বিচ্ছুরণ ও ঘটিয়েছে - তার পারঙ্গমতা সম্পর্কে এর থেকে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? "

অভিনয়ের ব্যাপারে কামেরার সামনে উত্তম ছিল স্মার্ট ও সাবলীল দুইই। যত সাধারণ শট ই হোক না কেন উত্তমের অভিনয়ে আলাদা একটা ছোয়া থাকত - সে জামার বোতাম খোলার আর টাই বাঁধার শট ই হোক বা চায়ের পেয়ালায় নিছক চুমুক দেওয়ায় দৃশ্য হোক কিম্বা টেলিফোন এর নম্বর ডায়াল করার শট ই হোক।

উত্তমের অনেক ছবি আমরা বহুবার করে দেখেছি। বহু ছবি অনেক বছর পর re-run এ ৪/৫ সপ্তাহ ধরে

হাউস ফুল হয়েছে। আর এখনকার অভিনেতাদের ছবি re-run হবার কথা ভাবাই যায় না। এখনকার ছবি দুবার দেখা তো প্রায় অলীক কল্পনার পর্যায়ে পরে।

এন্টনি ফিরিস্টি, নায়ক, চিড়িয়াখানা, কলঙ্কিত নায়ক, অগ্নিশ্বর, জতুগৃহ, বনপলাশীর পদাবলী, অমানুষ - এ রকম কিছু ছবি উত্তম না হলে তৈরী হত না। এই সব ছবিতে উত্তমের অভিনয় একেবারে বিশ্বমানের। কলঙ্কিত নায়ক বা জতুগৃহ র নিরব অভিনয়ে শুধুমাত্র চোখের দৃষ্টি দিয়ে যে বাস্তব অভিনয় উত্তম করে গেছে তার তুলনা মেলা দুষ্কর।

নায়কের সেই সংলাপ "I will go to the top, the top and the top" বা এন্টনি ফিরিস্টি ছবির শেষ সংলাপ - "এর কি কোনো প্রয়োজন ছিল?" তনুজার নিখর শরীরটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে অপার্থিব শূন্যতার দৃষ্টি নিয়ে হাটে হাটে দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া - সে কি ভুলে যাওয়া যায় নাকি উত্তম ছাড়া কারোর কাছে পাওয়া গেছে?

নায়কের গল্পই সত্যজিত রায় লিখেছিলেন উত্তমকে ভেবে। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের স্টার হয়ে ওঠার গল্প। প্রতিটি ফ্রেম এ কি অভিনয় না উত্তম করে গেছে।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে অপেক্ষারত প্রযোজককে বলা কুছ খায়েঙ্গে - কেনা? এই বলে কলার ছড়াটা তুলে দেখানো এবং তার মধ্যে যে অবজ্ঞা, তচ্ছিল্য এবং কৌতুকের যে মিশ্রণ, বা গ্রামের রেল স্টেশন এ নেমে খোলা হওয়া ফাঁকা প্লাটফর্ম - চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে যে stardom থেকে সাময়িক মুক্তির যে নিশ্বাস তারই মধ্যে শর্মিলাকে চায়ের ভাঁড়টা

ইসং তুলে একই সাথ উইশ করা এবং কোনো সংলাপ ছাড়া শুধু ভুরু এবং চোখ দিয়ে যেন জিজ্ঞেস করা - চা খাবেন নাকি? কি সূক্ষ্ম অভিনয় মানিক বাবু করিয়ে নিয়েছেন উত্তমকে দিয়ে এবং পুরোটাই অত্যন্ত stylish ভাবে।

আরো আছে - শর্মিলা যখন অটোগ্রাফ চায় তখন মার্জিত কৌতুকের সাথে জিজ্ঞেস করা বাংলা ছবি টিবি দেখার বদভ্যেচ নেই বোধয়? তারপর অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে যখন দেখে পেনে কালী ঝরছে না তখন পেনের নিবটা আলতো করে গ্লাসেস

জলে ডুবিয়ে সই করা ব্যাপারটা অতি উচ্চ মানের instinctive অভিনয়ের নিদর্শন। মানিক বাবু নিজে একথা লিখেছেন - এবং এও বলেছেন যে এটা স্ক্রিপ্টে ছিল না সম্পূর্ণ ব্যাপারটা উত্তমের তাত্ত্বগিক রিঅ্যাকশন।

নায়ক ছবির রাত্রের দৃশ্যটাও ভোলা যায় না - যেখানে ইসং মাতাল অরিন্দম ট্রেনের দরজা খুলে বাইরের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে - রেল লাইন পিছিয়ে যাচ্ছে - তীব্র গতিতে রাজধানী এক্সপ্রেস ছুটছে অরিন্দমের মুখে আলো আঁধারের আঁকি বুকি আর হতাশা, বিরক্তি, রাগ এবং শূন্যতা সব কিছু মিশিয়ে উত্তমের মুখে এক অসাধারণ এক্সপ্রেসন।

সৌমিত্র তার একটি লেখায় বলেছেন 'অভিনেতা হিসেবে লোকটা এত powerful, এত বড়, শুধু তাই নয় এক যুগের ইনস্টিটিউশন এর মত। উত্তম কুমারকে বাদ দিয়ে কি বাংলা সিনেমা ভাবা যায়?

উত্তম চলে যাওয়ার পর ১৯৮০ সালে কলকাতা দূরদর্শন উত্তমের উপর সত্যজিত রায়ের একটি দীর্ঘ সাক্ষাত্কার সম্প্রচার

করেছিল - শামিক বান্দোপাধ্যায় সেটি নিয়েছিলেন। মানিক বুঝা তাতে বলেছেন যে উত্তম ছিল একেবারে খাঁটি প্রফেশনাল হলিউড অভিনেতাদের মত। সেট এ আসত একেবারে তৈরী হয়ো যার জন্য বেশি রিহার্সেলের দরকার হত না - বেশির ভাগ ১ / ২ টো take এই শট OK হয়ে যেত।

সেই ইন্টারভিউ তে মানিক বাবু বলেছিলেন - উত্তমের মত কেউ নেই - উত্তমের মত কেউ হবে না।

এই মর্মে আনন্দবাজার পত্রিকাতেও মানিক বাবু উত্তম প্রসঙ্গে একটি লেখায় এই কথা টি বলেই তার লেখাটি শেষ করেছিলেন.



56 White Swan Road, MT. Roskill, Auckland 1041, NZ

T: 09 627 0009 **M:** 022 106 0913 **E:** sandhya_badakere@yahoo.com

Swar Sadhana Academy of Indian Music

This Institute was formed in January 2008 in Auckland.

It has an Affiliation with Sur Jhankar Academy of Mumbai. .

A course has been designed to provide training ranging from:-

Voice culture and voice production technique,

A strong base in Hindustani Classical Raags and semi classical forms

Rendition of bhajan, ghazals and Bollywood songs.

Our main focus has been to offer a four year training course up to a certificate level recognized by government of Maharashtra.

We maintain a good Guru Shishya Parampara at the Academy.

Group coaching for children of 5 years to 12 years

Individual training for children above 12 years and for adults.

For further details please contact

Sandhya Rao Badakere (director)

096270009

0221060913

With Best Compliments from



Importers and Distributors of well known brands and quality FMCG products

Urja

Edible Oils, Rice, Mango Pulp, Rusks, Biscuits, Spices, Pickles, Curry Pastes & Papads



MTR

Ready To Eat Meals, Rice, Drinks & Pre-mixes



Bikano

Snacks & Sweets



Frooti Appy & Cafe Cuba

Drinks



Midas

Papads, Pastes, Chutneys & Pickles



India Gate

Basmati Rice



Dabur & Fem

Herbal Products



Super Max

Shaving Range



Rasoi Magic

Pre-mixes

Nestle India

Maggi Noodles

Jabsons

Flavoured Nut Snacks

Tata Salt

Vicco

Cosmetics

Bajaj

Cosmetics

Mavana

Incense Sticks

AB INTERNATIONAL LTD | "Bringing Together a World of Goodness"

T (09) 256 1400 F (09) 256 1402 E orders@abinternational.co.nz

Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.



**FASTEST WAY TO SEND
MONEY TO INDIA**
Baroda Rapid Funds2India

KEY BENEFITS ARE:

- Hassle free credit to the beneficiary's account with Bank of Baroda's branches in India instantly
 - Same day credit to the beneficiary's account with branches of other banks.
 - No minimum and maximum amount of money Transfer.
 - Confirmation of credit to the remitter through their home branch through SMS alert.
 - Two remittances free of service charge every month to account holders.
 - Terms and conditions apply as per the type of account.
- Note: This facility is not available for trade related transactions

OUR SERVICES

WE PROVIDE
HOME LOANS
BUSINESS LOANS
INTERNET BANKING
INTERNATIONAL DEBIT CUM
ATM CARD

MANUKAU BRANCH

726 Great South Rd
PO Box 97726, manukau
Ph: 09 261 0018, fax: 09 261 0019
Email: manunz@bankofbaroda.com

AUCKLAND BRANCH

114 Dominion Rd
PO Box 56580, Mt Eden, Auckland
Ph: 09 632 1020, Fax: 09 632 5082
Email: aucknz@bankofbaroda.com

WELLINGTON BRANCH

55 Featherston Street
PO Box 5813, wellington 6011
Ph: 04 4471097, Fax: 04 499 4343
Email: wellnz@bankofbaroda.com

www.barodanzltd.co.nz